দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর ভূমিকা

(The contribution of Maolana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi in Spreading Islamic education)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ আবুল কাসেম

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নম্বর-১২৪/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন-২০২১ খ্রি.

Dhaka University Institutional Repository

দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর ভূমিকা

(The contribution of Maolana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi in Spreading Islamic education)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোহাম্মদ ইউছুফ

অধ্যাপক

আরবী বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ আবুল কাসেম

এম.ফিল গবেষক

রেজিঃ নম্বর-১২৪/২০১৬-২০১৭

আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবী বিভাগ-এর অধীনে এম.ফিল গবেষক মোঃ আবুল কাসেম (রেজিঃ নম্বর-১২৪, শিক্ষাবর্ষ ২০১৬-২০১৭) কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত **"দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর ভূমিকা (The contribution of Maolana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi in Spreading Islamic education)"** অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লিখিত হয়েছে। এটি সম্পূর্ণরূপে গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম। এটি তথ্যবহুল ও একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় এ শিরোনামে কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত কপিটি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম ফিল ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করতে অনুমোদন করছি।

তারিখ:

(ড. মোহাম্মদ ইউছুফ)
অধ্যাপক
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, **"দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর ভূমিকা (The contribution of Maolana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi in Spreading Islamic education) "** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমি এ গবেষণা কর্মের পূর্ণ অথবা আংশিক কোথাও প্রকাশ করিনি।

(মোঃ আবুল কাসেম)
এম.ফিল গবেষক
রেজি: নং–১২৪/২০১৬-২০১৭
যোগদান: ২০-০৯-২০১৭

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত বিবরণী

অনু	অনুবাদ
খ.	খণ্ড
খ্রি.	খ্রিষ্টাব্দ
ইং	ইংরেজি
ড.	ডক্টর
হি.	হিজরি সন
বাং	বাংলা সন
আ.	আলাইহিস্ সালাম
র.	রাহ্মাতুল্লাহি ‘আলায়হি
রা.	রাদিয়াল্লাহু আন্হু
স.	সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
মৃ.	মৃত/মৃত্যু
মো.	মোহাম্মদ
জ.	জন্ম
পৃ.	পৃষ্ঠা
সং	সংস্করণ
তা. বি.	তারিখ বিহীন
ড.	ডক্টর
দ্র.	দ্রষ্টব্য
ই.ফা.বা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
সম্পা.	সম্পাদনা/সম্পাদক
Adi	Adition
Ed.	Edited by
OP. Cit.	Oper Citao
P.	Page
Trs.	Translation
Vol.	Volume
Pub.	Publisher

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আলহামদুলিল্লাহ, প্রথমেই মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যিনি আমার এই গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের তৌফিক দিয়েছেন। অন্তরের অন্তস্থল থেকে দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দিশারি, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর উপর কিয়ামতের দিবসে যার সুপারিশ আমাদের একান্ত কাম্য। অতঃপর কৃতজ্ঞতা জানাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কলা অনুষদ ও আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষক এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে, যাদের কারণে আমি এ গবেষণা কর্ম সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই এ গবেষণা কর্মের সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, আরবী ভাষা ও সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সুযোগ্য, সুদক্ষ অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান, Centre for Arabic Teaching, Training & Research (CATTR)-এর সম্মানিত পরিচালক ড. মোহাম্মদ ইউছুফ-এর প্রতি। যাঁর সঠিক তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় এ গবেষণা কর্মটি সম্পাদন সম্ভব হয়েছে। বলা যায় আমার গবেষণা কর্মটির শুরু থেকে তার উৎসাহ উদ্দীপনা ও পরামর্শ গবেষণায় আমাকে অনেক শক্তি, সাহস ও প্রেরণা যুগিয়েছে।

এ অভিসন্দর্ভটি সম্পন্নের ক্ষেত্রে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন আরবী বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল কাদির এবং আমার আরবী বিভাগের সম্মানিত শিক্ষকমণ্ডলী, তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও মোবরকবাদ জানাচ্ছি।

এ গবেষণা সম্পন্নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন লাইব্রেরির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতা পেয়েছি। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, পাবলিক লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ লাইব্রেরি সহ আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও সুধীজনদের প্রতি জানাচ্ছি আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার কর্মক্ষেত্র পূর্ব পুটিয়াখালী দারুচ্ছালাম ফাজিল মাদ্রাসার সম্মানিত অধ্যক্ষ ও আমার সহকর্মীদের সহযোগিতা, যাদের সহযোগিতা না পেলে অত্র গবেষণা কর্ম সম্পাদন কোনো ভাবেই সম্ভব হত না।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা-মার প্রতি, যারা আমাকে সার্বক্ষণিক উৎসাহ যুগিয়েছেন। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমার মামা মাওলানা খলীলুর রহমান নেছারাবাদীর প্রতি, যার সার্বক্ষণিক সহযোগিতায় আমার গবেষণা কর্মটি শেষ করতে পেরেছি।

অতি আন্তরিকতার সাথে, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, রাতের ঘুমকে উপেক্ষা করে, দিবসের ব্যস্ততাকে ফেলে রেখে এ অভিসন্দর্ভের নিখুঁত ঝকঝকে ও উন্নত মানের কম্পিউটার কম্পোজ করার ও মান বৃদ্ধির জন্য ছোটো ভাই মো: সোলায়মান ও বড়ো ভাই এস এম মাজহারুল ইসলামকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি বড়ো ভাই মো: শহিদুল হক, মো: সাইদুর রহমান, ড. মো: আমিনুল হক ও মো: আ: আলিম-এর প্রতি। এ গবেষণা কর্মের জন্য তাদের রয়েছে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সহযোগিতা। বন্ধুবর মো: মুহিব্বুল্লাহ ও ড. মো: ফয়জুল হককে আন্তরিক মোবারকবাদ জ্ঞাপন করছি, যারা বিভিন্নভাবে এ গবেষণা কর্মে সহযোগিতা প্রদান করেছেন।

পরিশেষে আমার সহধর্মীনি মোসা: নাবিলা দীর্ঘদিনব্যাপী এ গবেষণা কর্মের জন্য ধৈর্য ধারণ করে আমার গবেষণার সুযোগ করে দিয়েছে তাকে প্রাণঢালা ভালোবাসা জ্ঞাপন করছি। আমার গবেষণার জন্য তাদের ত্যাগই ছিল আমার প্রেরণার উৎস।

অসংখ্য সুহৃদ, সহকর্মী, শুভানুধ্যায়ী, শুভাকাঙ্ক্ষী, ভাই-বোন ও আত্মীয় স্বজন যারা অপরিসীম ভালোবাসা, আত্মত্যাগ ও অনুপ্রেরণা দিয়ে এ গবেষণা ত্বরান্বিত করতে সাহস যুগিয়েছেন তাদের সবাইকে প্রাণ উজার করা শ্রদ্ধা, স্নেহ ও সৌহার্দ্য জানিয়ে মহান আল্লাহর নিকট সকলের উত্তম প্রতিদানের আরজ রেখে এবং অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এ অভিসন্দর্ভটি আল্লাহর দরবারে কবুলিয়াতের প্রার্থনা করছি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আল-আমীন সংশ্লিষ্ট সকলকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন।

মোঃ আবুল কাসেম

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

		প্রত্যয়ন পত্র	**I**
		ঘোষণা পত্র	**II**
		সংকেত বিবরণী	**III**
		কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**IV- V**
ভূমিকা	:		**১-২**
প্রথম অধ্যায়	:	**মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর জীবন দর্শন**	**৩-৩৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ		মাওলানা নেছারাবাদীর জন্ম ও বংশ পরিচয়	**৩**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন	**৭**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		ইলমে তাছাউফ চর্চা ও দাওয়াতের কাজে নেছারাবাদী (রহ.)	**১২**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		পারিবারিক জীবন	**২৩**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		মাওলানা নেছারাবাদীর কর্মজীবন	**২৯**
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ		মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে নেছারাবাদীর অবদান	**৩৪**
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর অবদান**	**৩৮-৫৩**
প্রথম পরিচ্ছেদ		ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা	**৩৮**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত দীনি প্রতিষ্ঠান	**৪৬**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন	**৫০**
তৃতীয় অধ্যায়	:	**মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর রচনাবলি**	**৫৪-৯২**
প্রথম পরিচ্ছেদ		শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক রচনাবলি	**৫৪**

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		আকাঈদ ও দর্শনমূলক রচনাবলি	**৭০**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		সমালোচনা ও জীবনীমূলক রচনাবলি	**৮৩**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদীর ভাষণ সংকলন	**৮৭**
চতুর্থ অধ্যায়	:	**দীনের বিভিন্ন বিষয়ে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা**	**৯৩-১১৮**
প্রথম পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষা ও পার্থিব শিক্ষা	**৯৩**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে মুসলিমগণের শ্রেণি বিভাগ	**৯৯**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলামী জিন্দেগীর রূপরেখা	**১০৩**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		তাহরীফে দীন ও তাজদীদে দীন সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা	**১০৬**
পঞ্চম পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলাম ও রাজনীতি	**১০৯**
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ		পীরের অনুসরণ **সম্পর্কে** নেছারাবাদীর চিন্তাধারা	**১১১**
সপ্তম পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলাহে হুকুমতের জন্য আন্দোলন	**১১৪**
অষ্টম পরিচ্ছেদ		নিসবাতের মূল্য সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা	**১১৭**
পঞ্চম অধ্যায়	:	**কারামত ও দর্শন**	**১১৯-১৪৫**
প্রথম পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদী (রহ.)-এর কারামত	**১১৯**
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ		নেছারাবাদী (রহ.)-এর দর্শন	**১২৭**
তৃতীয় পরিচ্ছেদ		ইন্তেকাল ও **কাফন-দাফন**	**১৩০**
চতুর্থ পরিচ্ছেদ		সমসাময়িক আলেম ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেছারাবাদীর অবস্থান	**১৩৮**
	:	**উপসংহার**	**১৪৬-১৪৭**
	:	**গ্রন্থপঞ্জি**	**১৪৮-১৫১**
	:	**পরিশিষ্ট**	**১৫২-১৫৫**

Dhaka University Institutional Repository

জুন-২০২১ খ্রি.

এ্যাবস্ট্রাক্ট

দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর ভূমিকা

(The contribution of Maolana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi in Spreading Islamic education)

১৫৫ (একশত পঞ্চান্ন) পৃষ্ঠায় লিখিত অভিসন্দর্ভটিতে ৫ (পাঁচ)টি অধ্যায় ও ২৫ (পচিশ)টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। এতে যে সব বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে তার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

- বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (র) ছিলেন বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ আলিম, দূরদর্শী নেতা, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, নিষ্ঠাবান মুবাল্লিগ, সমাজসেবী ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর সারাটি জীবন মানবকল্যাণে নিয়োজিত ছিল। এ অভিসন্দর্ভটিতে মাওলানা নেছারাবাদীর জন্মপূর্ব অবস্থা, জন্ম, বংশ পরিচয়, পূর্ব পুরুষ, বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- মাওলানা নেছারাবাদীর কর্ম জীবন ও ইসলাম প্রচার ও প্রসারে এবং দাওয়াহ বিস্তারে তাঁর অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।
- মাওলানা মুহম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর পীর নেছারুদ্দীন (রহ.) সহ অনেক পীর-আউলিয়া, কবি-সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গুনীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে।
- মুসলমানদের হারানো গৌরব ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে মাওলানা নেছারাবাদীর প্রচেষ্টা ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে
- ইসলামের সঠিক শিক্ষা সকল মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং একটি পরিকল্পিত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে নেছারাবাদী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- ইসলামী শিক্ষার বিস্তারকল্পে মাওলানা নেছারাাদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও দ্বীনি শিক্ষা বিস্তারে এসব প্রতিষ্ঠানের অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড়, মাঝারি মিলে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলোর সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হয়েছে।
- দীনি বিভিন্ন বিষয়ে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা ও দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
- সমসাময়িক আলেম ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেছারাবাদীর অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

(মোঃ আবুল কাসেম)
এম.ফিল গবেষক
রেজি: নং–১২৪/২০১৬-২০১৭
যোগদান: ২০-০৯-২০১৭
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

এই পৃথিবীতে যুগে যুগে এমন কতক মানবের আগমন ঘটে যারা জাতিকে সঠিক পথ দেখায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন, গোমরাহীর বেড়াজালে আবদ্ধ মানুষগুলোকে তারা সঠিক পথের দিশা দেন। মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) ছিলেন এমনই একজন। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ধনী-গরিব, সাদা-কালো, হিন্দু-মুসলিম, বৌদ্ধ-খৃস্টান, নারী-পুরুষ সকলকেই তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন একজন মহান ওলী ও আধ্যাত্মিক নেতা। তিনি ছিলেন দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সু-সংগঠক। সততায়, নিষ্ঠায় ও উদারতায় অতুলনীয়। তিনি সমাজকে এমনভাবে সাজাতে চেষ্টা করেছিলেন যাতে সমাজের প্রত্যেক মানুষ পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে বসবাস করতে পারে। তিনি মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ, শ্রেণি বৈষম্য, ধনী-গরিবের ভেদাভেদ এই সামাজিক ব্যাধিগুলোকে চিরতরে বিলুপ্তির চেষ্টা করেন। তিনি সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়ার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন। মাদ্রাসার নাম শুনে যখন অনেকে শুধু মৌলবাদ ও গোঁড়ামী শিক্ষার কেন্দ্র মনে করত তখন তিনি তাদের এসব ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এদেশে অগণিত মাদ্রাসা। ছাত্র জীবনে শিক্ষকদেরকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করতেন। শিক্ষকরাও তাকে অতিস্নেহ করতেন। শিক্ষক হিসেবে ছিলেন ছাত্রদের কাছে একজন শ্রদ্ধার পাত্র। মা-বাবার একান্ত আপন ছিলেন। স্বামী-হিসেবে ছিলেন আদর্শ স্বামী, বাবা হিসেবে ছিলেন একজন আদর্শ অভিভাবক, প্রতিবেশী হিসেবে ছিলেন অনেক পরোপকারী। নির্যাতিত-নিপিড়িত মানুষগুলো তার নিকট আশ্রয় নিত। ইলমে শরীয়ত ও তরীকতে তার অবস্থান ছিল অতুলনীয়। তিনি শরীয়তের প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অনেক সূক্ষ্ম জ্ঞান রাখতেন। এসব বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। একারণে সমকালীন জ্ঞানীদের অনেকেই নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন নেছারাবাদীর অবস্থান নিঃসন্দেহে অনেকের উর্ধ্বে। ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন বিকাশে নেছারাবাদী (রহ.)-এর অবদান অপরিসীম। তিনি তার সমস্ত জীবন দীনের খেদমত করেছিলেন। আল্লাহর দীনের প্রকৃত শিক্ষা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তিনি সারাটা জীবন প্রচেষ্টা করে গেছেন। তিনি অনেক মসজিদ, মাদ্রাসা, ইয়াতীমখানা, হেফজখানা, ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, খানকা, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, নূরাণী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষা তুলে ধরতে অবিরাম লিখেছেন। তার বিশাল কর্ম জীবনের ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তার সকল কিতাব ছিল দীনের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত। এমন একজন মহান ওলীর জীবন ও

Dhaka University Institutional Repository

অবদান সম্পর্কে অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রয়োজন, যাতে করে সমাজের মানুষ তার সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে। আশাকরি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির দ্বারা মানুষ আধ্যাত্মিকতা, সমাজসেবা, সংস্কার ও মসজিদ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা লাভ করবে।

এই অভিসন্দর্ভটি ৫টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে তার জীবনের সর্ব পর্যায়ের তথ্য ও তত্ত্ব সন্নিবেশিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

১ম অধ্যায়ে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর জীবন চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

২য় অধ্যায়ে দীনি শিক্ষা বিস্তারে নেছারাবাদীর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন কমপ্লেক্স, মাদ্রাসা, মসজিদ, খানকা ও সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় অধ্যায়ে দীনি শিক্ষা বিস্তারে নেছারাবাদীর লিখিত গ্রন্থাদি সম্পর্কে আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৪র্থ অধ্যায়ে দীনের বিভিন্ন বিষয়ে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা আলোচনা করা হয়েছে।

৫ম অধ্যায়ে নেছারাবাদীর কারামত, ইন্তেকাল, বিভিন্নস্থানে শোক প্রকাশ, পত্রিকার অভিমত ও তাঁর সম্পর্কে গুণিজনদের মন্তব্য বর্ণনা করা হয়েছে। এই অভিসন্দর্ভটি নতুন প্রচেষ্টা তাই এটি হয়ত সবদিক দিয়ে সন্তোষজনক হয়নি। আশাকরি ভবিষ্যতে কোন গবেষক এ পথে আরও নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। মহান আল্লাহ এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন।

প্রথম অধ্যায়
মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর জীবন দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ
মাওলানা নেছারাবদীর জন্ম ও বংশ পরিচয়

আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে যত আওলিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন তার বেশির ভাগই ধর্মহীন পরিবেশে প্রেরণ করেছেন। সেই সমাজে কিছু নামধারী মুসলমান পাওয়া গেলেও তাদের সকল কাজ-কর্ম ছিল অন্য ধর্মের সাথে মিল। সেই রকম জাহেলিয়াত কর্মকাণ্ডে ভরপুর একটি সমাজে এসেও তারা তাদের আদর্শ দ্বারা সে সমস্ত এলাকায় দীন প্রচার করেছিলেন। যুগে যুগে এ পৃথিবীতে অগণিত মুজতাহিদ, মুজাদ্দিদ[১] ও পীর মাশায়েখের আবির্ভাব ঘটেছে। এ পীর মাশায়েখরা তাঁদের এখলাস ও অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ইসলামের অমীয়বাণী ও সুমহান আদর্শ প্রচার করেছেন। এ মহাপুরুষদের মাঝে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছেন মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.)। নিম্নে তাঁর জীবন দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

জন্মপূর্ব অবস্থা ও জন্মস্থান

ঝালকাঠি একটি প্রাচীন জনপদ। আরবদের সাথে সমুদ্র বন্দরের প্রাচীন বাণিজ্যিক যোগসূত্র থাকার দরূন এ অঞ্চলে প্রাচীনকালে জনপদ ও বাণিজ্য কেন্দ্রের অবস্থান ছিল। ধারণা করা হয় যে, আরব মুসলিম বণিকদের মাধ্যমেই এসব অঞ্চলে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছে।

মাওলানা নেছারাবাদী (রহ.)-এর জন্মটা হয়েছিল বিশ শতকের মাঝামাঝি এক দীনহীন পরিবেশে। তখন এই দক্ষিণ অঞ্চলের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক ও দুঃখজনক। ঝালকাঠি ছিল

---

১ মোজাদ্দেদ (المجدد) আরবি শব্দ, যার অর্থ সংস্কারক। মোজাদ্দেদের পরিভাষায় د.يوسف الشريف বলেন-

عالم دين يبعثه الله على رأس كل مائة سنة ليجدد للناس دينهم عن طريق القيام بأعمال جليلة ونشر العلم الديني بين الناس، بالإضافة إلى إحياء سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحاربة البدع المنتشرة بين الناس في زمانه

প্রতি শতাব্দিতে মুসলিম সমাজ সংস্কার, মুসলমানদের মধ্যে অনুপ্রবেশকৃত অনৈসলামিক রীতির মূলোৎপাটন এবং ইসলামের প্রকৃত আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবির্ভূত হন মোজাদ্দেদ। বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর ওফাতের পর এ পৃথিবীতে আর কোনো নবী-রাসুল আসবেন না। তাই শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর প্রচারিত দীন কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তবে এই ইসলাম ধর্মের ভিতরে নানাবিধ ভুল ভ্রান্তি ও কুসংস্কার প্রবেশ করার কারণে জগতের মানুষ সঠিক ধর্ম পালন করতে পারে না তখনই মহান আল্লাহ্ জগতের বুকে একজন মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক প্রেরণ করেন। সুনানে আবু দাউদের ৪২৯১ নম্বর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে-"(إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها) প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে এই উম্মতের জন্য মহান আল্লাহ্ একজন মোজাদ্দেদ বা সংস্কারক প্রেরণ করেন। যিনি ধর্মকে সজিব ও সতেজ করে থাকেন ।" (দ্র.মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ. এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ১১)

তখন হিন্দু জমিদারদের ব্যবসায়িক কেন্দ্র। ঝালকাঠিকে ২য় কলকাতা বলা হত। ঝালকাঠি ছিল প্রসিদ্ধ বন্দর। তখনকার হিন্দুরা এখানে ব্যবসা বাণিজ্য করত খুব জাকজমকভাবে। নেছারাবাদী হুজুরের জন্ম ঝালকাঠি শহরের পাশেই বাসন্ডা নামক গ্রামে। বড়ো বড়ো হিন্দু জমিদাররা এ গ্রামে বাস করত। হিন্দু জমিদারদের বিরাট দালান-কোঠা, বৈঠকখানা ও চারপাশ বাঁধানো পুকুরসহ বিভিন্ন স্মৃতি আজও এ গ্রামটিতে পড়ে আছে। এ গ্রামে তখন কোনো মাদ্রাসা মক্তব বা বড়ো ধরনের মসজিদ ও দীনি পরিবেশ ছিল না।

একটি মাত্র মসজিদ ছিল যা হুজুরের বর্তমান পুরাতন বাড়িতে অবস্থিত। সেটি তাঁর পিতা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মুসলমানগণ হিন্দুদের সাথে তাদের পূজা পার্বণ ও বিয়ের অনুষ্ঠানসহ সব কিছুতেই শরীক হত। এক কথায় বলা যায় নেছারাবাদী (রহ.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন এই এলাকায় ইসলামী তাহজীব, তামাদ্দুন ও কৃষ্টি- কালচার বলতে কিছু ছিল না।[২]

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৯১১ খৃষ্টাব্দের কোনো এক শুভক্ষণে হুজুর (রহ.) ঝালকাঠি জেলার নেছারাবাদ (তৎকালীন বাসন্ডা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

স্বীয় পীর নেছারুদ্দীন (রহ.)[৪] নামানুসারে রাখা নেছারাবাদ গ্রামের বাসিন্দা হিসেবেই তাকে নেছারাবাদী বলা হয়। নেছারাবাদীর পিতা বাহাদুরপুরের পীর বাদশাহ্ মিয়া (রহ.)[৫]-এর খলিফা ছিলেন।[৬]

---

২ মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৭), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ১৪

৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৪ এই পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালা দীন প্রচারের জন্য যত আওলিয়ায়ে কেরাম প্রেরণ করেছেন মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ(রহ.) তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন শিরক বিদাআত ও কুসংস্কার নির্মুলের এক সংগ্রামী মর্দে মুজাহিদ, কঠোর সাধক, আবেদ, জহেদ, মহান সুফী দরবেশ। তিনি ১৮৭৩ সালে বর্তমানে পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার ছারছীনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। যুগশ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল, হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি শৈশব কাল হতে ছিলেন ব্যতিক্রমী। নিজ গ্রামের পাঠশালায়ই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। নেছারুদ্দীন আহমদ এর বয়স যখন বার (১২) বছর, তখন তাঁর পিতা হাজী সদরুদ্দীন সাহেব হজে যেতে চান। একমাত্র ছেলেকে রেখে হজে যাওয়ার প্রাক্কালে তাঁকে বিবাহ দিয়ে যেতে চাইলেন। তাই প্রতিবেশী এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব দলীলুদ্দীন সিকদারের কন্যাকে পুত্রবধু করে ঘরে আনেন। পুত্রের বিবাহ শেষ করে ছদরুদ্দীন সাহেব হজে যান। হজ পরবর্তী সময়ে সদরুদ্দীন সাহেব পবিত্র মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁর দাদা ছিলেন জহির উদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি তখনও জীবিত । ইসলামী জ্ঞানার্জনের তাগিদে তিনি প্রথম মাদারীপুর যান। মাদারীপুরের সন্নিকটে ইসলামিয়া মাদ্রাসায় তিনি প্রাথমিক ও দাখিল (এস.এস.সি) পাশ করে নেছারউদ্দীন আহমদ ঢাকায় হাম্মাদিয়া মাদ্রাসায় আলিম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ঢাকা হইতে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছিলেন। এই মাদ্রাসায়ও তিনি দীর্ঘদিন লেখাপড়া করেন নাই। এর পর হুগলী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে নেছারুদ্দীন আহমদ লেখাপড়া শেষ করেন। তৎকালীন সময়ের অন্যতম ইসলামী চিন্তাবিদ ও আধ্যাত্মিক রাহবার হযরত মাওলানা শাহ্ ছুফী আবু বকর ছিদ্দিকী (রহ.) হুগলি পাশ্ববর্তী অঞ্চলে একটি মাহফিলে আসেন। সেখানে নেছারুদ্দীন আহমদ ওয়াজ

নেছারাবাদীর পারিবারিক ইতিহাস ঐতিহ্য এক বর্ণাঢ্য জীবনের ইতিহাস বলা চলে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ষোড়শ শতকের শেষ প্রান্তে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইসলাম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন, তাদেরই একজন ঐ বাসন্ডা গ্রামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। নাম মরহুম কোরবান মুন্সী, বংশানুক্রমে মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী তাদের বংশেরই একজন। কোরবান মুন্সী সাহেব মক্কা শরীফের জান্নাতুল মুয়াল্লায় সমাধিস্থ আছেন।[৭] নেছারাবাদীর পিতার নাম মৌলভী মফিজুর রহমান[৮] এবং মাতার নাম ছিল জিনাতুন্নেছা।[৯]

শুনতে গেলেন। মাগরিবের নামাজবাদ নেছারুদ্দীন আহমদ মাহফিলের সামনে বসলে হজরত আবু বকর ছিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁকে দেখতে পান এবং অনেক ঘটনার পর তিনি হজরত আবু বকর ছিদ্দিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তাঁর নিকট থেকেই খিলাফত লাভ করেন। তিনি খিলাফত লাভের পর নিজ বাড়িতে ফিরে আসেন। দেশে আসার পর তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন এবং রোগ মুক্তির পর তিনি মক্কা শরীফে হিজরত করিবার দৃঢ় সংকল্প করেন। মাতা, স্ত্রী ও জেষ্ঠ্য পুত্র এবং ছোটো ভগ্নিপতিসহ জাহাজ যোগে হজব্রত পালনে পবিত্র মক্কা শরীফ যান। মক্কা শরীফ অবস্থানকালে তাঁর স্ত্রী ছাহেরা খাতুন ও বড়ো পুত্র শাহ মোহাম্মদ মুজাহার ইন্তেকাল করেন। এই ঘটনার পর মায়ের পরামর্শে হজপর্ব শেষ করে মাকে নিয়ে দেশে চলে আসেন। নেছারুদ্দীন আহমদ পবিত্র মক্কা শরীফ হতে দেশে ফিরে নিজ পীরের অনুমতি নিয়ে দীন-ইসলামের খেদমতে ব্রতী হন। মানুষের মাঝে ইলমে দীনের প্রচারের পাশাপাশি লেখালেখির কাজও করেন। তাঁর রচিত মাসয়ালা-মাসাইলের প্রসিদ্ধ কিতাব হলো-তরিকুল ইসলাম। এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা হলো "পাক্ষিক তাবলীগ"।

১৯৫২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার মোতাবেক মাঘ মাসের ১৬ তারিখ রাত ৯-৪৫ মিনিটে ৮৭ বৎসর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

৫ বাংলাদেশে যে সমস্ত পীর মাশায়েখ আবাদ করেছেন তাদের মধ্যে পীর বাদশাহ মিঞা অন্যতম। তিনি ১৮৮৪ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পীর বাদশাহ মিঞার অনেক অবদান রয়েছে। হাজী শরীয়াতুল্লার উত্তারাধিকারী পীর বাদশাহ মিঞা উপমহাদেশের মুসলমানদের মুক্তি আন্দোলনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন। ১৯২১ সালে তিনি খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে কারাগরে আবদ্ধ কবেন। ২ বছর কারাগরে থাকলেও এই মুজাহিদ থেমে যাননি। বরং ইংরেজ সরকারের কবল থেকে উপমহাদেশের মানুষদের মুক্ত করতে তিনি জনগণকে আজাদী আন্দোলনে উৎসাহিত করেন। চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত ১৯২১ সালে মহানগরী কলকাতার খিলাফত কমিটির মিটিং থেকে এসে তিনি আরো সংগ্রামী হয়ে ওঠেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সর্বত্র সভা সমাবেশ করে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন করেন। ঐ সালেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে গ্রেপ্তার করে নেয়ার সময় মাদারীপুরে এসডিওর বাসায় তাকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হয় এবং একটি চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার অনুরোধ জানানো হলে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। পরদিন পুলিশ অফিসার তাকে মেজিস্ট্রেটের নিকট নতি স্বীকার করতে বললে তিনি এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেন। পীর বাদশাহ মিঞা তাঁর সমসাময়িক প্রতিটি জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে ছিলেন। ১৯৩৬ সালে শেরে বাংলার কৃষক প্রজা পার্টিরও তিনি অন্যতম নেতা ছিলেন। এই মহান সংগ্রামী নেতা ইসলামী রাষ্ট্রের আকুল আগ্রহ বুকে নিয়া ১৯৫৯ সালে ইন্তেকাল করেন।

৬ অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, এই সেই ঝালকাঠি (ঝালকাঠি: আল ইসলাম পাবলিকেশন্স, নভেম্বর ২০০১ খ্রি.), ১ম সংস্করণ, পৃ. ১১০

৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

৮ মৌলভী মফিজুর রহমানের পরিচয়: তিনি ছিলেন একজন দীনের একনিষ্ঠ খাদেম। মৌলভী সাহেব নামে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। হেদায়াত ও তাবলীগে দীনের কাজে তিনি তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। শেরক, বেদয়াত, সুদী কারবার ও অশ্লীল কার্যকলাপের বিরুদ্ধে খুব বেশি ওয়াজ নছীহত করতেন এবং এসব কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকার জন্য লোকদেরকে খুব বুঝাতেন। তিনি সফরে গিয়ে রাতে ওয়াজ

নামের বহুমুখী ব্যবহার

অভিসন্দর্ভে উল্লিখিত মহান ব্যক্তিত্বের নাম মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহঃ)। তবে তাঁর নাম বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এই গবেষণা শিরোনামে তার নাম লেখা হয়েছে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী। তাঁর লিখিত পুস্তকে তার নাম লিখা হয়েছে মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)। বিশিষ্ট লেখক অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ তাঁর রচিত 'এই সেই ঝালকাঠি' নামক গ্রন্থে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী।[১০]

মাওলানা নেছারাবাদী নিজের অছিয়ত নামার শেষে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী।[১১] তিনি "কায়েদ সাহেব হুজুর" নামেই বেশি পরিচিতি লাভ করেছেন বিধায় তাঁকে কায়েদ সাহেব হুজুর নামেই সকলে চিনত। আবার তিনি "নেছারাবাদী" নামেও পরিচিত ছিলেন।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, তার প্রকৃত নাম মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী। কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে লকব লাগানো হয়েছে। আবার কখনও লকব ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আবার কখনও বানানের কিছু রদ-বদল হয়েছে মাত্র।

করতেন এবং বাদ ফজর ঐ এলাকার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে ডেকে শেরক, বেদয়াত, সুদী কারবারসহ সমাজ বিরোধী ও অশ্লীল কাজে জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা করে তাদের বাড়িতে লোক পাঠিয়ে তাদের হাজির করতেন। তিনি তাদেরকে এসব কাজ ছেড়ে দেয়ার জন্য বলতেন এবং তওবা করিয়ে দিতেন। প্রয়োজনে তিনি এসব অপরাধীর সামাজিকভাবে বিচার-আচার করতেন। সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাকে খুব মান্য করতেন এবং তাঁর সব ফয়সালা মেনে নিতেন। তিনি ছিলেন হাজী শরীয়তুল্লার উত্তরসুরী হযরত রশীদ উদ্দীন আহমদ ওরফে পীর বাদশাহ মিয়ার একজন খলিফা। খিলাফতির সনদ হিসেবে তাঁর কাছে পিতলের পাত্রের উপর লিখিত একটি সনদ ছিল যা এখনও রক্ষিত আছে। তিনি খৃস্টান মিশনারীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান এবং ওয়াজ নসীহতে এ ব্যাপারে কঠোরভাবে বক্তব্য রাখতেন। ১৮৬১ সনে মুসলিম ও খৃস্টানদের মধ্যে পিরোজপুরে যে বাহাছ বা তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় তার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। (দ্র. মাওলানা রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১৭, পৃ. ১৬)

৯ জিনাতুন্নেছাঃ নেছারাবাদীর মায়ের নাম ছিল জিনাতুন্নেছা। তিনিও ছিলেন একজন ধর্ম পরায়ন উদার মনের মহিলা, দীনের প্রতি তার ছিল আন্তরিক দরদ, নেছারাবাদী (রহ.) একান্ত বৈঠকে প্রায়ই তার কথা বলতেন, আমার মা একজন আল্লাহর খাঁটি ওলি ছিলেন। যদিও আমি মায়ের কাছে থেকে তার খেদমত করার সুযোগ খুব কম পেয়েছি। তবে মর্জির খেলাফ আমি কখনো কিছু করতাম না। একবার বাড়িতে এসে মাকে বললাম, মা! আমারতো এখন কর্তব্য আপনার কাছে থেকে আপনার খেদমত করা। কিন্তু বেশিরভাগ সময় ছারছীনা থাকার কারণে এ সুযোগ আমার হচ্ছে না। মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা! আমি তোমাকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিলাম। তুমি দীনের খেদমত করতে থাক, এতেই আমি খুশি, আমার কাছে থাকতে হবে না। আমি দোয়া করি আল্লাহ তোমাকে দীনের খাদেম হিসাবে কবুল করুন। (দ্র. মাওলানা রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ২০১৭), পৃ. ১৭)

১০ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

১১ মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী, হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, সেপ্টেম্বর ২০০৬), ১ম প্রকাশ, পৃ. ১৬০

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
বাল্যকাল ও শিক্ষা জীবন

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) ছোটকাল থেকেই শান্ত স্বভাবের ছিলেন। তাঁর চরিত্রের উন্নত গুণাবলী শৈশব ও কৈশোরেই পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি শরীয়াতের কঠোর পাবন্দ ছিলেন। ছোটবেলা থেকেই পড়াশুনার প্রতি গভীর মনোযোগী ছিলেন। তিনি তৎকালীন খ্যাতনামা আলেমদের নিকট থেকে জ্ঞানার্জন ও সোহবত লাভের জন্য ছুটে যেতেন। নিম্নে নেছারাবাদীর বাল্যকাল ও শিক্ষাজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

বাল্যকাল

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) এর মধ্যে বাল্যকাল থেকেই একজন খাঁটি আল্লাহর ওলীর গুণাগুণ প্রকাশ পেতে থাকে। ছোটোবেলা থেকে মানুষের সাথে সদাচরণ করতেন। কারো সাথে বিবাদে জড়াতেন না এবং কোন ধরনের খেলাধুলায় তিনি মনোনিবেশ করতেন না। তার ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ ছিল, সকলেই তাকে ভালোবাসত। ছোটোবেলার একটি ঘটনা থেকেই তার বাল্যাবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। নেছারাবাদী (রহ.) তার বাড়ির সামনে একটি পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। নীকুঞ্জ নামক এক হিন্দু ভদ্রলোক পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন, তিনি হুজুরকে খুব স্নেহ করতেন, শিক্ষক নিকুঞ্জ বাবু পান খেতেন। একদিন তিনি তার ছাত্রদের ডেকে বললেন, তোমরা আগামীকাল আমার জন্য কিছু সুপারি নিয়ে এসো। শুধু এটুকু বলেই তিনি চলে গেলেন। পরদিন কোন ছাত্রই সুপারি নিয়ে এলো না। আর গুরু মহাশয় নিকুঞ্জ বাবুও সে কথা ভুলে গেলেন। ছুটি শেষে সবাই চলে গেল, গুরু মহাশয় দেখতে পেল দরজার পাশে বালক আযীযুর রহমান একটি পুটলি হাতে দাঁড়িয়ে আছে। গুরু মহাশয় জিজ্ঞাসা করল, সোনামনি তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? হুজুর বিনয়ের সাথে জবাব দিলেন, গুরু মহাশয় আপনার জন্য বাড়ি থেকে কিছু সুপারি নিয়ে এসেছি। গুরু মহাশয় অবাক দৃষ্টিতে বালক আযীযুর রহমানের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সুপারি কয়টি হাতে নিয়ে হুজুরের মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, সোনামনি ঈশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন। তোমার জন্য আশীর্বাদ করি। তুমি যেন সেরা মানুষ হিসেবে বিশ্বের বুকে পরিচিত লাভ করতে পার।[১২]

১২ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

শিক্ষা জীবন

প্রাথমিক শিক্ষা

নেছারাবাদী (রহ.) ছোটোবেলা থেকেই প্রখর মেধাবী ছিলেন। তিনি নিজ গ্রামের পাঠশালায় প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। নিজ গ্রামের পাঠশালায় বাল্য শিক্ষার পাশাপাশি তিনি চাঁদকাঠী কেন্দ্রীয় মসজিদের তৎকালীন ইমাম মরহুম মৌলভী মুহসীন উদ্দীন ফরিদপুরী ছাহেবের কাছে আরবী শিক্ষা লাভ করেন।[১৩]

উচ্চশিক্ষা

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হওয়ার পরই হুজুরের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি দেশ বিদেশের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধ্যয়ন করেন।

ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

লেখাপড়ার প্রতি নেছারাবাদীর অদম্য আগ্রহ দেখে তার মহিয়সী মাতা হুজুরকে মাদ্রাসায় পড়াবার সিদ্ধান্ত নেন। তখন এই এলাকার কিছু ছাত্র ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়াশুনা করত। হুজুরকে তার মাতা তাদের সাথে ১৯৩০ ইং সনে ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় পাঠিয়ে দেন।[১৪] ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় নেছারাবাদী (রহ.) জামাতে দাহমে ভর্তি হন। সেখানে অধ্যয়নকালে নেছারাবাদী (রহ.) প্রখর মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। যার কারণে ছাত্র, শিক্ষক ও এলাকাবাসীর কাছে তিনি অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। ভোলার বিভিন্ন প্রোগ্রামে তাকে অতিথি করা হত। তিনি সেখানে ১৯৩৫ খ্রি. পর্যন্ত পড়াশুনা করেন।

ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

তিনি যখন ভোলা আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র তখন তিনি এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি মাঝে মাঝে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকতেন। তখন মাদ্রাসা বন্ধ ছিল বিধায় তিনি বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির লোকজন সবাই চিন্তায় অস্থির ছিল। আল্লাহ তাঁয়ালা তাকে এই রোগ থেকে মুক্তি দেয়ার পর তিনি ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় পড়তে আগ্রহী হন।

---

১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

এরপর ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায়[১৫] জামাতে পাঞ্জমে ভর্তি হন। **তিনি এক বৈঠকে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন–**

"ছারছীনা মাদ্রাসায় পড়াশুনা করা আমার অন্তরে থাকলেও আমাদের সংসারের যে অবস্থা ছিল তাতে ছারছীনা মাদ্রাসার মত এত বড়ো প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার চিন্তা করাও ছিল দুষ্কর। এরপরেও আমি আমার মনের কথাটা আমার মায়ের কাছে বললাম। মা বড়ো ভাইয়ের কাছে ছারছীনা মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে আমার আগ্রহের কথা জানালেন। তিনি ভীষণ রাগ করলেন। কারণ তখন সংসার চালানোই খুব কষ্টের ব্যাপার। মা আমার আগ্রহ দেখে মিঞা ভাইকে রাজি করালেন। মিঞা ভাইজান আমাকে নিয়ে ছারছীনা মাদ্রাসায় গেলেন। প্রথমে আমরা গিয়ে ছারছীনা শরীফের পীর মরহুম হযরত নেছারুদ্দীন আহমদ সাহেব (রহ.)-এর সাথে দেখা করলাম। হুজুর কেবলা আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন। কারণ আমার আব্বা মরহুম মৌলভী মফিজুর রহমানকে পীর সাহেব কেবলা খুব মহব্বত করতেন। হুজুর কেবলা তার এক খাদেমকে ডেকে আমাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বললেন। খাওয়া-দাওয়া শেষে মিঞা ভাইজান পীর সাহেব হুজুরের কাছে আমার ভর্তির ব্যাপারে বললে হুজুর কেবলা সাথে সাথে মাদ্রাসার তৎকালীন সুপার সাহেবকে ডেকে আমাকে ভর্তি করে নিতে এবং বোর্ডিং এ একটি সিট দিতে বললেন। আমি ভর্তি হতে পেরে আল্লাহর শোকর আদায় করলাম। মিঞা ভাইজান বাড়িতে চলে এলেন। আমি ছারছীনাতে থেকে গেলাম। আমি পাঞ্জমে ভর্তি হলাম, তখন বন্ধের মাত্র একমাস বাকি ছিল। দীর্ঘ মাস বন্ধের পরে ফাইনাল পরীক্ষা হবে। মাদ্রাসা থেকে আমাকে কিছু কিতাব দেয়া হল। কিন্তু দু'খানা কিতাব যা খুব প্রয়োজনীয় তা মাদ্রাসায় ছিল না।

---

১৫ যুগশ্রেষ্ঠ ওলিয়ে কামিল, হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) বর্তমান পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি থানায় ছারছীনা গ্রামে ১৯০৫ সালে ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ সূফী নেছারউদ্দীন আহমদ ১৯০৫ সালে একখানা গোলপাতার কুতুবখানা জাতীয় ঘর নির্মাণ করে দীন শিক্ষার কার্যক্রম শুরু করেন।সেই ঘরে ১৯১৮ সালে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসার সিলেবাস অনুসারে একটি মাদ্রাসার কাজ শুরু করা হয়। মাদ্রাসার নাম দেওয়া হয় ছারছীনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা। ১৯১৯ সালে গোলপাতা নির্মিত কুতুবখানাকে পাকা ভবনে উন্নীত করা হয় । ১৯২৭ সালে মাদ্রাসাটি প্রথম দাখিল পরীক্ষা দেয়ার সরকারি অনুমতি পায়। ১৯২৮ সালে মাদ্রাসাটি জামাতে উলার পরীক্ষা দেয়ার অনুমতি লাভ করে। ১৯৩৭ সালে জামাতে উলার স্থায়ী মঞ্জুরি পায় । ১৯৩১ সালে ফুরফরার পীর মোজাদ্দেদে জামান হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ.) ছারছীনা আগমন করেন এবং মাদ্রাসার জন্য পাকা ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শাহ সূফী নেছারউদ্দীন আহমদ (রহ.) তার সম্পত্তি ১৯৩৪ সালে মাদ্রাসার জন্য ওয়াকফ করে দেন। ১৯৩৫ সালে দ্বিতল ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। তখন কলকাতার বাইরে আর কোথাও টাইটেল মাদ্রাসা ছিল না। ১৯৩৮ সালে এই মাদ্রাসায় টাইটেল পড়ানো শুরু হয়। তখন কলকাতার বাইরে টাইটেল খোলার অনুমতি ছিল না কিন্তু এই মাদ্রাসার জন্য এ কে ফজলুল হক পূর্বের আদেশ বাতিল করে কলকাতার বাইরে টাইটেল খোলার অনুমতি দেন। ১৯৪৪ সালে ছারছীনা মাদ্রাসার টাইটেল মঞ্জুরি পায়। টাইটেল মঞ্জুরি দেয়ার জন্য বাংলার গভর্নর জন হারবার্ট এবং বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ১৯৪০ সালে ছারছীনা মাদ্রাসায় আসেন। শেরে বাংলার চেষ্টায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে সর্বপ্রথম এই ছারছীনাই টাইটেল খোলার অনুমতি পায়।

আর কিতাব দু'খানা সংগ্রহ করে হাতে লিখে নিলাম। যা হোক বন্ধে বাড়ি চলে গেলাম। মনে শুধু একটাই ভয়, বন্ধের পর পরীক্ষা। পরীক্ষায় পাশ করতে পারবতো। এত বড়ো প্রতিষ্ঠানে যেখানে সব মেধাবী ছাত্রদের মেলা। আর আমিতো তেমন ক্লাশ করারও সুযোগ পেলাম না। যা হোক আল্লাহর উপর ভরসা করে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন" এ নীতিকে সামনে রেখে পড়াশুনা শুরু করলাম। কোনো কারণে পরীক্ষার সময় পিছিয়ে গেল। এটা আমার জন্য হলো এক মহা সুযোগ। যথা সময়ে পরীক্ষা দিলাম। পরীক্ষা দেয়ার সময় লক্ষ করলাম ওস্তাদগণ বার বার আমার কাছে এসে আমার পেপার দেখছেন। আমি তখন কিছুই বুঝতে পারিনি। পরীক্ষার রেজাল্ট বের হলো। আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম।"[১৬]

নেছারাবাদী (রহ.) এর পরিবার ছিল খুব অভাব অনাটনের মধ্যে, তাই ছাত্র জীবনে তাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। যে কষ্ট অন্য কেউ করলে হয়ত তার পড়ালেখা চালিয়ে নেয়া সম্ভব হত না। এত কষ্টের মধ্যেও তিনি কোনো অন্যায় পথের আশ্রয় নেননি। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন–

"আমি তখন ছারছীনা মাদ্রাসায় পড়ি। বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকা চেয়ে মায়ের কাছে চিঠি লিখেছিলাম। আমার মা বহুজনের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়েও পেলেন না। নিরাশ হয়ে তিনি তার ব্যবহার্য গলার জিনিস বন্ধক রেখে সুদে কিছু টাকা এনে তা পাঠালেন। আমি এ খবর শুনে মায়ের কাছে টাকাগুলো ফেরৎ পাঠিয়ে দিলাম এবং মাকে চিঠি লিখে জানালাম, এভাবে আমার জন্য কখনও টাকা পাঠাবেন না। আমি আল্লাহর রহমতে ফরয আন্দাজ ইলমে দীন শিক্ষা করেছি। এখন যা শিখব তা নফল, সুদের টাকায় ইলমে দীন অর্জন করাকে জায়েয মনে করি না। আল্লাহর শোকর এরপর থেকে আমার চলতে কোন কষ্ট হয়নি। আমি আমার রুমে মাসে মাসে

কিছু কেরোসিন তৈল কিনে বিক্রির জন্য রাখতাম, সেগুলো ছাত্রদের কাছে বিক্রি করে যে সামান্য লাভ হত তাতে আমার চলে যেত। আমি আমার ছাত্র জীবন থেকেই সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করেছি। সওয়াল করাটাকে সব সময় আমি ঘৃণা করতাম। আর্থিক অসচ্ছলতার কথা কখনও কারো কাছে প্রকাশ করতাম না। কারণ সর্ব প্রকার সওয়ালকেই আমি নাজায়েয মনে করি। ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসায় তিনি ফাযিল পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। ১৯৪০খ্রি. ফাযিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কলকাতা

১৬ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

মাদ্রাসা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে বৃত্তি পান।"[১৭]

কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়ন

মাওলানা নেছারাবাদী ফাযিল পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য উপমহাদেশের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী শিক্ষার সূতিকাগার কলকাতা আলিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হওয়ার মনস্থ করেন। বাংলাদেশে তখন ফাযিলের উপরে ক্লাশ ছিল না, কিন্তু নেছারাবাদী (রহ.)-এর শিক্ষা গ্রহণের অদম্য স্পৃহা তাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তখন কামিল করার জন্য শুধু ছিল কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসা।[১৮] তাই নেছারাবাদী (রহ.) কামিল ডিগ্রীর জন্য **১৯৪১** সনে ঐতিহাসিক কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি সেখান থেকে তাফসির, হাদীস, ফিকাহ, উসূলে ফিকাহ, বালাগাত, মানতিক ও তাছাওফ শাস্ত্রেসহ বিভিন্ন বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন।

নেছারাবাদী (রহ.) এর শিক্ষকমণ্ডলী

* মাওলানা শামসুদ্দীন আলম (রহ.)

* মাওলানা ইয়াহইয়া সাহ-সারামী (রহ.)

* শায়খুল ওলামা মাওলানা বেলায়েত হোসাইন বীরভুমি (রহ.)

* শামসুল ওলামা মাওলানা মোল্লা সফিউল্লাহ সরহদী ওরফে মোল্লা সাহেব (রহ.)

* বাহরুল উলুম মাওলানা মুহাম্মদ হুসাইন সিলেটী (রহ.) প্রমুখ।[১৯]

---

১৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৮ কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠিত আলিয়া মাদ্রাসা। ১৭৮০ সালে ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস সর্বপ্রথম মাদ্রাসা-ই-আলিয়া নামে কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক দিকে প্রশাসনের জন্য, বিশেষ করে বিচার বিভাগের জন্য আরবি, ফারসি ও বাংলা ভাষায় দক্ষতার প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়া মুসলিম আইনের ব্যাখ্যা ও মামলার রায় দেওয়ার জন্য বিজ্ঞ মুফতির প্রয়োজন ছিল যাদের ইংরেজি ভাষায় জ্ঞান থাকারও প্রয়োজন ছিল। এই পরিস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস মুসলমানদের জন্য কলকাতায় একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাদ্রাসার প্রথম হেড মাওলানা নিযুক্ত হন মাওলানা মাজদুদ্দীনকে। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে মৌলভি বাহরুল উলুম মোল্লা মাজদুদ্দীন ইসলামী আইন ও বিচারব্যবস্থাকে প্রাধান্য দিয়ে পাশাপাশি গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন অন্তর্ভুক্ত করে কারিকুলাম প্রণয়ন করেন। ১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় ইংরেজি বিভাগ খোলা হয়। ১৯০৭ সালে কামিল কোর্স চালু হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮১৯ সাল পর্যন্ত 'বোর্ড অব গভর্নরস' দ্বারা মাদ্রাসা পরিচালিত হতো। ১৮১৯ সাল থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত ইংরেজ সেক্রেটারির পাশাপাশি মুসলমান সহকারী সেক্রেটারির অধীনে বোর্ড অব গভর্নরস পরিচালিত হয়। ১৮৫০ সালে আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষের পদ সৃষ্টি হলে ড. এ. স্প্রেংগার মাদ্রাসার প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৮৫০ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ২৬ জন ইংরেজ কর্মকর্তা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২৭ সালে শামসুল উলামা খাজা কামালউদ্দীন আহমদ সর্বপ্রথম মুসলমান অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদ্রাসা কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। (দ্র. আবদুল হক ফরিদী, মাদরাসা শিক্ষা: বাংলাদেশ (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫খ্রি.), পৃ. ৩০-৩৫; আবদুস সাত্তার, আলীয় মাদ্‌রাসার ইতিহাস, মোস্তফা হারুন অনূদিত (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.), পৃ. ২৪০-২৪৫)

১৯ গবেষক ০২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তার ছেলে মাওলানা খলীলুর রহমান নেছারাবাদীর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইলমে তাছাউফ চর্চা ও দাওয়াতের কাজে নেছারাবাদী (রহ.)

তাছাউফ শব্দের আভিধানিক অর্থ আধ্যাত্মিকতা। এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাসাউফ বলতে এমন জ্ঞানকে বুঝায় যে জ্ঞানের দ্বারা আল্লাহকে চেনা যায়, আল্লাহকে পাওয়া যায়, আত্মাকে আলোকিত করা যায়। ইসলামি পরিভাষায় তাছাউফ বলতে অবিনশ্বর আত্মার পরিশুদ্ধি বা তাজকিয়ায়ে নফস-এর মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সাধনাকে বুঝায়। বাল্যকাল থেকে মাওলানা নেছারাবাদী বাহ্যিক ইলম চর্চার পাশাপাশি তাছাউফ চর্চায় ব্রতী হন। তিনি তাঁর পীর মুজাদ্দেদে জামান শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর কাছে কাছ থেকে তাছাউফের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি শ্রেষ্ঠ চার তরিকার চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকার সবক গ্রহণ করেন। নিম্নে মাওলানা নেছারাবাদীর তাছাউফ চর্চা ও দাওয়ার্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে পালনীয় ইসলামের নীতি ও আদর্শসমূহকে শরীয়ত বলা হয়। এক কথায় শরীয়ত ইসলামের লিখিত সংবিধান যা হযরত রাসুল (স.) তাঁর জীবদ্দশায় পূর্ণ বাস্তবায়ন করে গেছেন। আর যে পদ্ধতি অনুশীলন দ্বারা আল্লাহর সাথে বান্দার যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং তাঁর চরিত্র নিজের ভেতর অর্জন করা সম্ভব হয়, তার নাম মারেফত।

রাসুল (স.) যে এলম জগত রেখে গেছেন তা দুই ভাগে বিভক্ত

১. এলমে শরীয়ত

২. এলমে মারেফত

শরীয়ত এবং মারেফত ইসলামের দুটি অপরিহার্য অংশ বিশেষ। ইসলামকে যদি একটি ফলের সাথে তুলনা করা হয়, তাহলে শরীয়ত হবে উপরের খোলস আর মারেফত হবে ভিতরের শাঁস। খোলস ছাড়া যেমন ফল হয় না তেমনি ভিতরে শাঁস ব্যতীত ফল অর্থহীন। দুটি অংশ নিয়ে যেমন একটি ফলের স্বার্থকতা তেমনি শরীয়ত ও মারেফত মিলেই পূর্ণাঙ্গ ইসলাম।

মোটকথা, মারেফত শরীয়ত ব্যতীত অর্জন হতে পারে না, তদ্রূপ শরীয়তও মারেফত ব্যতীত অর্জন হতে পারে না।

ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারেফত পৃথক কোন বিষয় নয়। ইসলাম এই দুই বিষয়কে আলাদা করেনি। গবেষণায় পাওয়া যায় ইলমে শরীয়তকে ইলমে মারেফত থেকে পৃথক কোনো বিষয় হিসেবে বর্ণনা করে যে সকল হাদীস প্রচলিত আছে সেগুলো সবই বানোয়ট ও মিথ্যা। মূলত

ইলমুল মারেফত বা ইলমে তাছাউফ এর সাথে কুরআন বা হাদীসে কোন বিরোধ নেই বরং সবই শরীয়াতের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন হাদীসের অনুগামী। ইহা কোনো স্বতন্ত্র ইলম নয়। মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী ছোটো বেলা থেকেই শরীয়ত ও মারফতের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন।

মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) মারেফতের শিক্ষা লাভ করলেও নিজেকে প্রকাশ করতে পছন্দ করতেন না। সর্বদা চেষ্টা করতেন তার থেকে যেন কোনো কারামতি মানুষের সামনে প্রকাশ না হয়ে যায়। কোনো কারামতি যদি প্রকাশ পেয়ে যেত তাহলে তিনি সেটা যে কারামত না সেটা মানুষকে বুঝানোর চেষ্টা করতেন। তিনি নিজের জীবনকে সকল প্রকার বেদায়াত মুক্ত রাখতেন। তিনি শরীয়তের বিধান পালনে যেমনি আন্তরিক ছিলেন তেমনি বেদয়াতের বিরুদ্ধে ছিলেন বজ্রকণ্ঠ। তিনি বেদায়াতি কাজকর্ম উৎখাত করার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। তরীকতের ব্যাপারে কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) যে কোন ছুন্নিয়া তরীকার অনুসরণ ওয়াজিব মনে করতেন। তিনি বলেন-'তাছাউফ ও তরীকতের ব্যাপারে আমি যে কোন সুন্নিয়া তরিকার অনুসরণকে ওয়াজেব মনে করি । তবে এটা চার তরিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করি না। কিন্তু ইসলামী ফালছাফাহে জেন্দেগীর ব্যাপারে আমি মুসলিম ও গায়রে মুসলিম নির্বিশেষে কোন দার্শনিকের অন্ধ অনুসরণকে না জায়েয মনে করি এবং দীনের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত মারাত্মক বলে বিবেচনা করি।'[২০]

সুন্নীয়া তরীকা ও বিদয়াতী ফেরকা সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন-"ঈমান ও আকায়েদের ব্যাপারে যেই তরীকা আহলে সুন্নতের অনুসারী সেই তরীকা সুন্নীয়া তরীকা নামে অভিহিত হয়। এই সুন্নিয়া তরীকা অনুসারীগণ জযবায়ে রহমানী লাভ করে। পক্ষান্তরে যেই তরীকা বিদয়াতের অনুসারী তারা বিদয়াতী ফিরকা নামে অভিহিত হয় এবং সেই তরীকার অনুসারীগণ জযবায়ে শয়তানী লাভ করে। আহলে সুন্নত অল জামায়াতের অনুসারীগণের মধ্যে যারা ইবাদাত বন্দেগী, জিকির, মোরাকাবা, মোয়ামালাত, মোয়াশারাত, আদব, আখলাক, লেবাছ পোশাক প্রভৃতি ব্যাপারে সুন্নত তরিকার পূর্ণ অনুসারী, তারাই প্রকৃত প্রস্তাবে কামিল মুসলমান।"[২১]

---

২০ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

নেছারাবাদী (রহ) এর পীরের[২২] প্রতি ছিল অগাধ ভক্তি। ছারছীনার পীরে কামেল নেছারুদ্দীন আহ্মদ (রহ) এর নিকট মুরীদ হওয়ার আগে ও তার ছারছীনা দরবারের প্রতি ছিল অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। তিনি সর্বদা পীরের নির্দেশ মোতাবেক চলতেন। আমৃত্যু শত কর্ম ব্যস্থতার মধ্যেও তিনি ছারছীনা দরবার শরীফের মাহফিলে যেতেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি ছারছীনা দরবার শরীফের ভক্ত ছিলেন। ছারছীনা দরবার শরীফের পীরে কামেল, মুজাদ্দে জামান শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর কাছে যেতেন এবং তার কাছ থেকে তাসাউফের[২৩] শিক্ষা গ্রহণ করতেন। তিনি চিশতিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মদিয়া তরীকার[২৪] সবক গ্রহণ করেন। তিনি নিজেই বলেন-"পীরে মরহুম

---

২২ পীর শব্দটি ফার্সি। শব্দগতভাবে এর অর্থ হল জ্ঞানী। মূলত যিনি আল্লাহ পাক এর সাথে রূহানী সংযোগ করে দেয়ার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, উনাকেই পীর সাহেব বলা হয়। কুরআন শরীফ ও হাদিস শরীফে যাদের আউলিয়া, মুর্শিদ ও শায়খ বলা হয়েছে, ফার্সিতে তাদের পীর সাহেব বলা হয়। পাক ভারতে ইসলামের প্রচার-প্রসার তথা স্থানীয় বিধর্মীদের মুসলমান হওয়ার ক্ষেত্রে ফার্সি ভাষি আউলিয়ায়ে কিরামদের ভূমিকাই মুখ্য। যে কারণে এ স্থানে মুসলমানদের বন্দেগী জীবনে ফার্সির অনেক পরিভাষাই ব্যবহৃত হয়। আরবী সালাত, সাওম এর পরিবর্তে যেরূপ ফার্সি নামায, রোযা ব্যবহৃত হয়ে থাকে (মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ, পৃ. ৪১)।

২৩ তাসাউফ বলতে বুঝায়-

التصوف تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة الدواعي النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة

তাসাউফের সাধারণ অর্থ-'সৃষ্টিকে ভুলে আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন থাকা। আবার কেহ কেহ বলেন, তাসাউফ সূফীবাদ সাফা শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উহার অর্থ পবিত্রতা। কারণ এই মতবাদের বিশ্বাসকারীগণ ধারণা করেন, মানুষকে যে তাহার অন্তরকে পবিত্র করতে হয় তা এর মাধ্যমে সম্ভব। আবার অনেকে বলেন, ''তাসাউফ' শব্দটি সওফ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ সূফীগণ অতি সাধারণ ভাবে বিনা আড়ম্বরে জীবন যাপন করিয়া থাকেন। 'সওফ' শব্দের ধাতুগত অর্থ হইল পশম। তাহারা অতি সাধারণ এক রকম পশম নির্মিত বস্ত্রই একমাত্র পরিধেয় হিসাবে ব্যবহার করিতেন । কেহ কেহ বলেন,'তাসাউফ' শব্দটি 'সুফ্ফা' শব্দ হইতে আসিয়াছে। যেহেতু রাসুল পাক (স.) -এর মসজিদের সম্মুখস্থ বারান্দায় আহলে সুফ্ফাগণ দুনিয়া ত্যাগীবস্থায় সর্বদা তসবীহ্ তাহলীল ও মোরাকাবা মোশাহেদায় মশগুল থাকিতেন। তাহাদের দ্বারাই রাসুল পাকের পরবর্তী সময় সূফী দলের বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সূফীমত প্রকাশ হয়ে পড়ে। বস্তুত যে বিজ্ঞান মানুষকে উত্তম চরিত্র গঠন করতে সাহায্য করে আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করত তাঁর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের পথ দেখায় এবং যার মাধ্যমে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুল (স.)-এর বিধান মোতাবেক শান্তিময় জীবন পরিচালনার শিক্ষা লাভ করা যায়, তাকে এল্মে তাসাউফ বলে । এল্মে তাসাউফকে এল্মুল ক্বালব, এল্মে মুকাশাফা, এল্মে লাদুন্নী, তাজকিয়ায়ে নফ্স প্রভৃতি নামেও অভিহিত করা হয়। তাসাউফের সাধনার মাধ্যমেই সমস্ত নবী-রাসুল-আওউলিয়ায়েকেরাম আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করে সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। (মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ, পৃ. ০৯)।

২৪ তরিকা(طريقة) শব্দটি আরবী তারিক শব্দ হইতে পরিগৃহীত হয়েছে। ইহার বাংলা অর্থ হলো পথ, রাস্তা ইত্যাদি।

* الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى বলেন,

الطريقة هي السيرة المختصة بالسالكين من قطع المنازل والترقي في المقامات

নেছারুদ্দীন (রহ.) এর নির্দেশে কামিল পাশ করার পর ছারছীনা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করি। মনে আছে তখন আমি মাসে ২৫ টাকা বেতন পেতাম। আমার ও আমার বড়ো ভাইয়ের সংসারের খরচ বাবদ বাড়িতে পাঠাতাম ২০ টাকা আর আমার ভাইর ছেলে তৈয়বের পড়াশুনার খরচ বাবদ তাকে দিতাম ৫টাকা। একদিন মরহুম পীর সাহেব কিবলা (রহ.) কুতুবখানায় শিক্ষকদের এক জরুরি বৈঠক হলো। সেখানে মূল আলোচ্য বিষয় শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি। হুজুর কেবলা সকল শিক্ষকদের দাবী-দাওয়া শুনলেন। অনেক শিক্ষক তাদের বেতন বৃদ্ধির ব্যাপারে সরাসরি প্রস্তাবও দিলেন, হুজুর কেবলা সবার কথা আন্তরিকতার সাথে শুনলেন। সবশেষে আমাকে সম্বোধন করে বললেন এ কি মিয়া আপনি তো কিছু বলছেন না? আপনাকে কত বাড়িয়ে দিতে হবে। হুজুর কেবলার মুখে এ কথা শুনে আমি কেঁদে ফেললাম। সকলে হতবাক, হুজুর কেবলা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন বাবা কি হয়েছে, বলুন, কাঁদছেন কেন? আমি কোনভাবে কান্না সম্বরণ করে বললাম, হুজুর আমি বেতনের জন্য চাকুরিতে আসিনি আপনার নির্দেশ পালন করেছি। বেতন বৃদ্ধির দাবি নিয়ে আজকের এই মজলিশে আমি উপস্থিত হইনি। আমার অন্তরে এরূপ কোন দাবীও নেই। আমার দুঃখ এই যে, আমার মনের অবস্থাটা আপনাকে বুঝাতে পারলাম না।"[২৫]

---

*الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه বলেন,

الطريقة هي الشريعة والشريعة هي الطريقة والفرق بينهما لفظي والمادة والمعنى والنتيجة واحدة.

অবশ্যই বুঝতে হবে যে, এই পথ কোনো সাধারণ পথ নয় বরং মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করার নিমিত্তে যে পথ অতিক্রম করা হয়ে থাকে মূলত সেই পথকেই তরিকা বলা হয়। ইসলামী আধ্যাত্মিক পরিভাষায় তরিকা হল বেলায়েতের জ্ঞান অর্জন করতে আল্লাহর ওলিগণের প্রবর্তিত বিভিন্ন সাধন পদ্ধতি আর সে পথটির সিলসিলা হচ্ছে নিম্নরূপ:

পবিত্র কুরআনের দিক নির্দেশনা এবং রাসুল (স). ও তাঁর পবিত্র আহলে বাইত-এর দিক নির্দেশনার আনুগত্য করাই হচ্ছে-মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিল অর্থাৎ পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর পথ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে: "লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসুলিল্লাহ্ উসওয়াতুন হাসানাহ। অর্থ: আল্লাহর রাসুলের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জন্য সকল সুন্দরের আদর্শ। রাসুল (স.) কর্তৃক মদিনা মনওয়ারাতে তৌহিদ বা এলাহিয়্যাতের শিক্ষা তথা মারেফাত অর্জনের যে শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার পথ চলা শুরু হয়েছিল পবিত্র কুরআন ও রাসুল (সা.)-কে আনুগত্যের মাধ্যমে।

হযরত আলী রা. যেহেতু রাসুল (সা.)-এর একনিষ্ঠ বিশ্বস্ত এবং গোপন ভেদের আমিন ছিলেন তাই তাঁর পরে তিনি দ্বিতীয় ব্যক্তি যিনি এই শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি স্বীয় জীবদ্দশায় বহু শিষ্য তৈরী করছিলেন এবং রাসুল (সা.)-এর পরে তাঁর সকল শিষ্যই হযরত আলী (রা.)-এর শিষ্যে পরিণত হয়েছিলেন।

হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-কে সূফীগণ প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পীর বলে অভিহিত করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মূল উৎস বলে মনে করেন। সেই জন্য হযরত রাসুলে কারীম (সা.) হতেই সমস্ত তরিকার উদ্ভব (মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ, পৃ. ৫৫)।

২৫ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

নেছারাবাদী (রহ.) তার খেলাফত লাভ ও আউলিয়া কেরামের সোহবত সম্পর্কে বলেন:

০১. "আমি চিশতিয়া[২৬], নকশাবন্দিয়া[২৭], মুজাদ্দেদিয়া[২৮] তরীকায় কুতুবুল আলম ছারছীনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর নিকট মশ্‌ক করেছি এবং বরিশাল জেল হাজতে থাকাকালীন মরহুম হযরত মাও. শাহ আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহ.)[২৯] এর নিকট কাদরিয়া[৩০] তরীকা মশ্‌ক করেছি।

---

২৬ এ তরিকার ইমাম হলেন সুলতানুল হিন্দ গরিবে নেওয়াজ খাজা মঈনুদ্দিন চিশতি (রহ.)। তিনি ৩৩৬ হিজরিতে ইরানের সিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৬১ হিজরিতে ভারতের আজমির শরিফে তাঁর ইন্তেকাল হয় । আনিসুল আরওয়াহ ও দলিলুল আরেফিন তাঁর লিখিত তাসাউফ বিষয়ক অনবদ্য ২টি কিতাব। তাঁর নামানুসারে এ তরিকার নামকরণ করা হয়। তাঁর থেকে ১৫ মধ্যস্থতায় এ তরিকা রাসুলে পাক (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ তরিকার অধিক প্রচলন রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে।

২৭ এ তরিকার ইমাম হলেন হজরত বাহাউদ্দিন নকশাবন্দ আল বোখারি (রহ.)। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মাদ ইবনে মোহাম্মাদ আল বোখারি। তার জন্ম হয় ৭১৮ হিজরি মহররম মাসে এবং তিনি ৭৯১ হিজরির ৩ রবিউল আউয়াল ইন্তেকাল করেন । তার থেকে ২২ মধ্যস্থতায় এ তরিকায় রাসুলে পাক (সা.) এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তার নামানুসারে এ তরিকার নামকরণ করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশসহ মধ্য এশিয়া এবং সিরিয়ায় এ তরিকার অধিক প্রচলন রয়েছে।

২৮ এ তরিকার ইমাম হলেন ইমামে রাব্বানি মুজাদ্দেদে আল ফেসানি শায়খ আহমাদ ফারুকি সিরহিন্দি (রহ.)। তিনি ওমর ফারুকের বংশধর। ৯৭১ হিজরির ১৪ শাওয়াল তার জন্ম হয় এবং তিনি ১০৩৪ হিজরির ৮ সফর ইন্তেকাল করেন । তার লিখিত মাকতুবাত ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। তার নামানুসারে এ তরিকার নামকরণ করা হয়। তার থেকে ২৮ মধ্যস্থতায় এ তরিকা রাসুলে পাক (সা.) পর্যন্ত পৌঁছেছে। এ তরিকার অধিক প্রচলন রয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে।

২৯ ওলিকুল শিরোমনি, পীরে কামেল শাহ সূফী আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ (রহ.) ১৯১৫ সনে রোজ বৃহস্পতিবার বর্তমান পিরোজপুর জেলার ছারছীনা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত পীরে কামেল মোজাদ্দেদে জামান শাহ সূফী হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)। তাঁর মাতার নাম মুহতারামা বেগম আফসারুন্নেসা। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারেফতের কামালিয়াত লাভ করার পর হেদায়াত, তাবলীগ, তা'লীম, বই-পুস্তক প্রণয়ন, পেপার-পত্রিকা প্রকাশসহ বিভিন্ন দীনি কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। তিনি দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে সমাজের সর্বস্তরের সংস্কার সাধনের চেস্টা করেছেন। তাঁর প্রচেস্টায় বিভিন্ন বাহিনীর ইউনিফর্ম হাফ প্যান্ট এর পরিবর্তে ফুল প্যান্ট প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা করেন। মসজিদের পানি ও বিদ্যুত বিল মওকুফ এবং শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, 'রেডক্রস'কে 'রেড ক্রিসেন্ট' নামে নামকরণ-তাঁর প্রচেস্টায়ই হয়েছিল। সামাজিক অনাচার ও অশ্লীলতার বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা আন্দোলন করেছিলেন। ইসলামী রীতি-নীতি পরিবর্তনের অপচেষ্টার প্রতিবাদ করতেন। বেপর্দেগী ও ইসলাম গর্হিত কার্যকলাপ এবং গান-বাজনা বন্ধের চেস্টা তিনি আজীবন করেছিলেন। ১৯৯০ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৪টায় তিনি ইন্তেকাল করেন।।

৩০ কাদেরিয়া একটি সুফি তরিকা। এ তরিকার উদ্ভব ষষ্ঠ হিজরিতে এবং এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আবদুল কাদির জিলানী (রহ.)। এ তরিকায় ইবাদতের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠোর অনুশীলন করা হয় এবং জাগতিক সকল প্রকার ভোগবিলাসিতা থেকে নিজেদের দূরে রাখা হয়। আবদুল কাদির জিলানী (রহ.) একজন সংস্কারক ছিলেন। তিনি মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করতেন এবং ধর্ম প্রচারের জন্য নিয়মিত প্রচেস্টা চালাতেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে ফতহ-আল-রব্বানী, ক্বাসীদা এবং ফুতুহ-উল-গায়াব। তাঁর বহু কেরামতির কথা বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। হযরত জিলানী (রহ.) সব সময়ই শরীয়াতকে সবকিছুর উর্ধ্বে রেখেছেন। তিনি কখনো ইবাদতে মগ্ন থেকে নামায বা ধর্মের নিয়ম-কানুনকে অবহেলা করেননি। তিনি তাঁর রোগশয্যায় মৃত্যুর পূর্বে

২. ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী (মা. জি. আ) সাহেব আমাকে তার খলিফা ঘোষণা করেছেন।

৩. আমি উলুভী তরীকার ইমাম আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ ইবনে উলুভী মক্কি আল হাসানী আল মালেকী এর নিকট হতে খেলাফত লাভ করেছি।

এ সময়ে আওলাদে রাসুল সল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম সৈয়দ মো: জয়নুল আবেদীন আমার সাথে ছিলেন।

৪. আমি যেসকল মাশায়েখে এযামের ছোহবত লাভ করেছি তাদের মধ্যে রয়েছে:

* হযরত আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান[৩১] মুজাদ্দেদী ও বরকতী (রহ.)

* হযরত আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী (রহ.)[৩২]

উযু করেন এবং নামায আদায় করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুদিবস ১১ রবিউস্ সানিকে বলা হয় ফাতিহা-ই-ইয়াযদহম। এ দিবস বাংলাদেশে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হয়। হযরত জিলানী (রহ.) প্রথমে তরিকাটি চালু করেন বাগদাদে। পরবর্তীকালে এটি এশিয়া ও আফ্রিকার অনেক দেশে (বিশেষত মিশর, মরক্কো, তুরস্ক এবং ভারতে) ছড়িয়ে পরে।

৩১ আমীমুল ইহসান ১৯১১ সালের ২৪ জানুয়ারি বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ হাকিম আবদুল মান্নান এবং মা সৈয়দা সাজেদা। পিতা ও মাতা উভয় সূত্রেই তিনি নাজিবুত্তারাফাইন। তার নাম 'মুহাম্মাদ ' এবং লকব 'আমীমুল ইহসান'। তার দাদা সাইয়্যেদ নূরুল হাফেয আল-কাদেরিও একজন কামেল মানুষ ছিলেন। তার বংশ-তালিকা নবী মুহাম্মাদ পর্যন্ত পৌঁছেছে বিধায় তার নামের পূর্বে 'সাইয়্যেদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন। আমীমুল ইহসান তার পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯২৬ সালে পনের বছর বয়সে কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। তিনি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে আলিম পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দে ফাযিল ও ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং "মুমতাজুল মুহাদ্দিসিন" উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি আলিম পরীক্ষায়ও হাদীস বিষয়ে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন। ১৯৩৪ সালে তিনি তার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ মাওলানা মুফতী মুশতাক আহমেদ কানপুরী (রহ.) সাহেব এর নিকট থেকে 'মুফতী' সনদ লাভ করেন। তখন থেকে তিনি 'মুফতী' খেতাবে আখ্যায়িত হন। মুফতী-এ আযম সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকাতী (রহ.) যেমন একজন হাক্কানী আলেমে দীন ছিলেন তেমনি ইলমে তাসাউফ এর প্রাণপুরুষ ছিলেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারকতী ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন।

৩২ মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী একজন বাংলাদেশী ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রখ্যাত আলেম, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলার পাটগাতী ইউনিয়নের গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মুন্সি মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ এবং মাতার নাম আমেনা খাতুন। তার পিতা মুন্সি আবদুল্লাহ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন । ছদর সাহেব পাটগাতীর স্থানীয় জনৈক হিন্দু পণ্ডিতের কাছে প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু করেন। এরপর বরিশালের সুটিয়াকাঠি স্কুল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে নোয়াপাড়ার বাঘরিয়া হাই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন। ষষ্ঠ শ্রেণি সমাপ্ত করার পর সপ্তম শ্রেণিতে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার এ্যাংলো পার্সিয়ান বিভাগ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে কিন্তু কিছুদিন পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে তখন তিনি কলেজ ত্যাগ করে থানাভবনে হাকীমুল উম্মাত মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর কাছে চলে আসেন। এরপর থানভী (রহ.) তাকে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সাহারানপুরের মাযাহিরুল উলুম মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিলে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে সেখানে ভর্তি হন । সেখান থেকে ইসলামিয়্যাতে স্নাতক শিক্ষা অর্জন করেন। এরপর দারুল উলুম দেওবন্দে উচ্চ শিক্ষা অর্জন করেন। তার শিক্ষকদের মধ্যে আল্লামা আনোয়ার শাহ

* হযরত মাওলানা হাসনাইন আহমদ জৌনপুরী (রহ.) প্রমুখ[৩৩]

বিভিন্ন ছেলছেলার সাথে তার সম্পর্ক

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) নিজে ছারছীনা তরীকার হলেও সকল হাক্কানী আওলিয়ায়ে কেরামের সাথে গভীর সম্পর্ক রাখতেন। "ফুরফুরা[৩৪], চরমোনাই[৩৫], জৌনপুর, বাহাদুরপুরসহ সকল বুজুর্গদের সাথে তার নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। যেমন জৌনপুরের হযরত মাওলানা হাফেজ হাসনাইন আহমদ, হযরত মাওলানা জালিস মাহমুদ, মরহুম মাওলানা আকীল সাহেব প্রমুখ। বাহাদুরপুর ছেলছেলার হযরত মরহুম পীর বাদশাহ মিঞা, চরমোনাইর পীরে মরহুম এবং তার পুত্র মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করীম (রহ.)।[৩৬] এ ছাড়াও তাবলীগ জামায়াতের[৩৭] শীর্ষস্থানীয় বেশ কজন আলেম আছেন যারা হুজুরের ছাত্র।"[৩৮]

কাশ্মীরী, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ও শায়খুল আদব এজাজ আলী (রহ.) প্রমুখ । তিনি মাওলানা জাফর আহমাদ উসমানী ও মাওলানা আব্দুল গনী প্রমুখ মনীষীগণ থেকেও খেলাফত প্রাপ্ত হন। ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী অগণিত ভক্তকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

৩৩ মুহম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, তরীকাই ছুন্নিয়া (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নভেম্বর,২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ১৮

৩৪ হুগলী জেলার অন্তর্গত ফুরফুরা অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ দরবার। ফুরফুরা শরীফের পীর সাহেব কিবলা (রহ.) এর পূর্বপুরুষগণ যখন বঙ্গদেশে আগমন করেন তখন ফুরফুরা শরীফ এবং তার আশপাশের গ্রামগুলো বলিয়া-বাসন্তী নামে পরিচিত ছিল। ৭৯৬ হিজরীতে সুলতান গিয়াস-উদ্দিন ভাগীরথী নদীর তীর নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সৈন্য পাঠান বাংলার ছোটো ছোটো সামন্তবাদী এলাকায়, জমিদারিতে। তখন সেনাবাহিনীর সাথে সাথে বিদগ্ধ আলেমরাও আগমন করেছিলেন। এমনি এক অভিযানে হযরত শাহ সূফী সুলতান (রহ.) সেনাবাহিনী সহ আগমন করেন বঙ্গ দেশের দিকে। হযরত সূফী সুলতান (রহ.) সৈন্যদের দুই ভাগ করলেন। নিজে একদল নিয়ে এগিয়ে গেলেন পাণ্ডু অভিমুখে, অন্য দলটা হযরত শাহ হোসেন বুখারী (রহ.) এর নেতৃত্বে বলিয়া-বাসন্তী দিকে এগিয়ে আসেন। এখানেই ফুরফুরা শরীফের গোড়াপত্তন। আল্লাহ তায়ালা ফুরফুরা শরীফে প্রেরণ করলেন একজন আদর্শ ধার্মিক পুরুষ, মৌলিক তাসাউফের অন্বেষী, সুন্নাতের পুনর্জীবনদানকারী, মুজাদ্দিদ-ই-জামান, হুজ্জাতুল ইসলামকে । তিনি বংশগত দিক দিয়ে ইসলামের প্রথম খলিফা, খলিফাতুর রাসুল, আসহাবে আজম হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) সরাসরি নাসল-ই-পাক। তার পবিত্র নাম হযরত আবু বকর সিদ্দিকী আল-কোরাইশী (রা.)।

৩৫ চরমোনাই বাংলাদেশের বরিশাল জেলার অন্তর্গত বরিশাল সদর উপজেলার একটি ইউনিয়ন। চরমোনাই ইউনিয়নের পশ্চিমে কীর্তনখোলা নদী ও চর বাড়িয়া ইউনিয়ন, পূর্বে ইলিশা নদী, উত্তরে আড়িয়ালখাঁ নদী এবং দক্ষিণে কড়ইতলা নদী, চর কাউয়া ইউনিয়ন, চাঁদপুরা ইউনিয়ন ও টুঙ্গিবাড়িয়া ইউনিয়নের সাহেবের হাট অবস্থিত। এ ইউনিয়নের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে বিশ্বাসের হাটের খাল, ডিংগামানিক-বুখাইনগর খাল, গিলাতলী-পশুরীকাঠী খাল, চরমোনাই-রাজারচর খাল, চরবুখাইনগর ও নলচর খাল। মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাক (১৯১৫-১৯৭৭) ছিলেন চরমোনাইয়ের প্রথম পীর ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি পীর সাহেব চরমোনাই নামে পরিচিত । দ্বিতীয় পীর তার সন্তান মাওলানা ফজলুল করীমের মৃত্যুর পর তিনি অনুসারীদের মাঝে 'দাদা হুজুর' নামে অভিহিত হন।

৩৬ সৈয়দ মুহাম্মাদ ফজলুল করীম ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের একজন রাজনীতিবিদ ও ধর্মীয় নেতা। তিনি পীর সাহেব চরমোনাই হিসাবেই অধিক পরিচিত ছিলেন এবং রাজনৈতিক দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চরমোনাই-এর পীর সাইয়েদ মুহাম্মদ ইসহাকের

বাইয়াত

পীর নেছার উদ্দীন (রহ.) এর অন্যতম খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাউকে মুরীদ করতেন না। দূর দুরান্ত থেকে বহু মানুষ আসত তার কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য কিন্তু তিনি মুরীদ করতেন না। খুব বেশি কেউ পীড়াপিড়ি করলে তাকে ছারছীনার পীর সাহেবের পক্ষে মুরীদ করাতেন। শেষ জীবনে বিশেষ কারণে মুরীদ করেছেন। তবে শেষ জীবনে কেন করেছেন এ সম্পর্কে বিগত ১৯-০৩-২০০২ ইং তারিখ এক বক্তব্যে তিনি বলেন–

"আমি ছারছীনার মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছারউদ্দীন আহমদ (রহ.) এর নিকট চিশতিয়া, নকশাবন্দী, মুজাদ্দেদিয়া ও মুহাম্মাদিয়া[৩৯] তরীকা মশ্‌ক করেছি। আমি যেহেতু ছাত্র জীবন হতে ওলামা মাশায়েখ ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছি। আমি স্বতন্ত্র কোন ছেলছেলা জারী করলে তা আমার উদ্দেশ্যে সাধনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এ চিন্তা করে আমি কাউকে মুরীদ করাতাম না। এখন দেখতেছি কিছু লোক এমন রয়েছে যারা কেবল আমারই মুরীদ হতে চান। আমি মুরীদ না করলে অন্য কারো নিকট মুরীদ[৪০] হবেন না। আর

সন্তান। আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ইসলামী শিক্ষায় ডিগ্রী অর্জনের পর ১৯৫৭ সালে লালবাগের জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া থেকে দাওরা-ই-হাদীস সম্পন্ন করেন। সৈয়দ ফজলুল করীম চরমোনাই মাদ্রাসায় শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার কর্ম জীবন শুরু করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০৬ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলনে তার সক্রিয় অবদান ছিল। ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে তার ইন্তেকাল হয়।

৩৭ তাবলীগ জামাত হল বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো একটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক সংগঠন ও ধর্মপ্রচার আন্দোলন, যার মূল কার্যক্রম হচ্ছে মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা। বিশ্বজুড়ে তাবলীগ জামাতের আনুমানিক ৮ কোটি অনুগামী রয়েছে , যার অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়ায় বাস করে, এবং প্রায় ২০০টি দেশে এর উপস্থিতি রয়েছে। ১৯২৬ সালে মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্ধলভি (রহ.) এই সংগঠনটি ভারতের মেওয়াতে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেওবন্দি আন্দোলনের একটি শাখা হিসেবে যাত্রা শুরু করে। তাবলীগ জামাত-এর মূল ভিত্তি হিসেবে ৬টি উসুল বা মূলনীতিকে ধারণ করা হয়। এগুলো হলো: কালিমা, নামায, ইলম ও যিকির, একরামুল মুসলিমিন (মুসলমানদের সহায়তা করা), সহিহ নিয়ত বা এখলাসে নিয়ত, এবং দাওয়াত-ও-তাবলীগ।

৩৮ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৩৯ সূফীবাদ বা আধ্যাত্মিক চিন্তা ধারায় অন্যতম তরীকা মুহাম্মদীয়া তরিকা। এ তরিকার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু ছিল সমাজ সংস্কার ও জিহাদ। এ মুহাম্মদি তরিকায় আধ্যাত্মিক জীবন ও মারেফতের সাথে শরিয়তের আইন-কানুন পালনের প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয় । এ তরিকা সূফীবাদের উদাসীনতা ও ধর্মীয় আচার-আচরণের প্রতি অবজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ। সকল কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ইমামুল হিন্দ শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিছে দেহলভী (রহ.)-এর ক্ষোভ ও প্রতিবাদের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর পুত্র ও খলিফা সিরাজুল হিন্দ ইমাম শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী (রহ.)-এর তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া। এ মুহাম্মদি তরিকার সাথে অন্যান্য তরিকার কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই । এ মুহাম্মদি তরিকার দ্বারা অন্যান্য চার তরিকার বিরোধিতা করা হয়নি। পূর্বোক্ত চার তরিকার সমন্বয়ে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব উন্নতির পথ প্রদর্শিত হয়েছে এ তরিকায়। এ আন্দোলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের জন্যে সে সব আচার ও নীতির প্রবর্তন করা, যা হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সময় প্রচলিত ছিল।

আমি যে তাহরীক (আন্দোলন) চালাচ্ছি, এমতাবস্থায় আমি আমার শায়েখের নিকট হতে যা শিখেছি তা অন্যকে বাতিয়ে দেয়া আবশ্যক মনে করছি। তাই অদ্য থেকে আমি তরীকার বাইয়াত[৪১] গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি।"[৪২]

দাওয়াতের কাজে নেছারাবাদী (রহ.)

দা'ওয়াহ্ বা দা'ওয়াত আরবী (دعوة) দা'ওয়াতুন শব্দ থেকে। এর মূল অক্ষর و -ع -ا বহুবচন دعوات (দা'ওয়াতুন)। আদ্ দা'ওয়াহ-এর শাব্দিক অর্থ- আহ্বান, নিমন্ত্রণ, প্রার্থনা, দু'আ, ডাকা, সাহায্য কামনা, মুকাদ্দামা অনুপ্রেরণা ইত্যাদি।[৪৩] "মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের লক্ষ্যে দ্বীন ইসলাম কর্তৃক আনীত সকল কল্যাণময় বিষয়ে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা এবং সকল মন্দ বিষয় হতে বিরত রাখার কাজে সুবিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সকল কর্মতৎপরতার নাম ইসলামী দা'ওয়াহ্।"[৪৪]

ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দা'ওয়াত। আলণ্ঢাহ তা'আলা যুগে-যুগে পথহারা মানুষকে

---

৪০ 'মুরীদ' শব্দটি আরবী। যার অর্থ হল ইচ্ছা পোষণকারী। যে ব্যক্তি আল্লাহর আদেশ নিষেধ আল্লাহ তায়ালা যেভাবে চান সেভাবে পালন করার ইচ্ছা পোষণ করে কোনো বুজুর্গ ব্যক্তির হাত ধরে শপথ করে, সে ব্যক্তির নাম হল 'মুরীদ'। একথা স্পষ্ট যে, পীর হবেন শরীয়াতের আদেশ নিষেধ পালন করার প্রশিক্ষণদাতা। আর যিনি সে প্রশিক্ষণ নিতে চায় সে শিক্ষার্থীর নাম হল 'মুরীদ '(মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ, পৃ. ৪১)।

৪১ বাইয়াত (আরবি- بَيْعٌ) শব্দটি একটি ইসলামিক পরিভাষা । এর অর্থ বিক্রয় করা, লেনদেন করা, শপথ করা, চুক্তি করা প্রভৃতি । তবে, ইসলাম ধর্মে অনেক সময় বাইয়াত বলতে শপথ পাঠ বা চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে।

পরিভাষায়-أخذ العهد والميثاق والمعاقدة على إحياء ما أحياه الكتاب والسنة

ইবনে খালদুন বলেন, العهد على الطاعة لولي الأمر

ইসলামী বিশেষজ্ঞরা বাইয়াতকে মোটামুটি ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন,

১. খিলাফাতের বাইয়াত-যা ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্যের প্রতীক হিসেবে নেয়া হয়ে থাকে।

২. বাইয়াতে ইসলাম-তথা ইসলাম গ্রহণের জন্য বাইয়াত নেয়া।

৩. বাইয়াতে তাসাওউফ-তাকওয়া পরহেযগারীতে অগ্রগামী হবার শপথের বাইয়াত।

৪. বাইয়াতে হিজরত-জিহাদ বা কাফেরদের জুলুমী রাষ্ট্র ছেড়ে দেয়ার বাইয়াত।

৫. বাইয়াতে জিহাদ-জিহাদের ময়দানে দৃঢ় থাকার বাইয়াত। যদি কখনো জিহাদের ময়দানে ভয়ে পালিয়ে যাবার শংকা দেখা দেয়, তখন আমীরে জিহাদের হাতে দৃঢ়তার বাইয়াত গ্রহণ করা। (দ্র. আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয, মিসবাহুল-লুগাহ (ভারত: মাকতাবা বুরহান, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.), পৃ. ৮০; শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী, আল-কাউলুল জামিল মা' শারহে শিফাউল আলীল (তা.বি.), পৃ. ৪।)

৪২ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৪৩ মুহাম্মদ আলা উদ্দিন আযহারী, আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ খ্রি.), খ.২, পৃ. ১৩০০ ।

৪৪ খলীফা হুসাঈন আল্ আস্সালা, মাআলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহাদিহাল মাক্কী (কায়রো : দারুত্ তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ্, ১৯৮৮ খ্রি.), খ.১, পৃ. ১৯।

সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার জন্য অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন যাঁরা এ দায়িত্ব দা'ওয়াতের মাধ্যমে সঠিকভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন। মাওলানা নেছারাবাদী পীরের কাছ থেকে এলমে তাছাওফের শিক্ষা গ্রহণ ও খেলাফত প্রাপ্ত হয়ে তিনি মানুষের হেদায়েতের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। তার হেদায়েতের কাজকে আমরা কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি।

০১. সাধারণ মানুষের মধ্যে দাওয়াত

০২. ওয়াজ নছিহত

০৩. অনৈতিক ও অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ

সাধারণ মানুষের মাঝে দাওয়াত

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করেন। এ সকল জেলার মধ্যে ঝালকাঠি, বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, বরগুনা, যশোর, খুলনা ও চট্টগ্রাম উল্লেখযোগ্য। ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি ছুটে চলেছেন দিক দিগন্তে। তার অক্লান্ত পরিশ্রম ও দাওয়াতের কারণে অনেক অমুসলিম পেয়েছিল ইসলামের সন্ধান। তারা আশ্রয় নিয়েছিল ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে। তিনি গ্রামবাসীর বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে প্রত্যেকের নাম বা সম্পর্ক ধরে ডাক দিতেন। প্রথমে তিনি কুশল বিনিময় করতেন। অতঃপর সুযোগ মত সুন্দর করে দীনের দাওয়াত দিতেন।

ওয়াজ নছিহত

ইসলাম প্রচার ও প্রসারের একটি অন্যতম মাধ্যম হল ওয়াজ নছিহত। নেছারাবাদী (র.) এ মাধ্যমটি যথাযথভাবে অবলম্বন করেছিলেন। তিনি নিজ অনুসারী ও সাধারণ মুসলমানদের হেদায়েতের জন্য বছরের অধিকাংশ সময় ওয়াজ নছিহতের জন্য সফরে থাকতেন। দীন প্রচারের এই পথটি চির উন্মুক্ত রাখতে তিনি বিভিন্ন স্থানে এই ব্যবস্থাপনাকে স্থায়ীকরণ করেছিলেন। ঝালকাঠি জেলার কুতুবনগর আযীযীয়া দাখিল মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিল, বরিশাল জেলার জিরাইল আযীযীয়া ফাজিল মাদ্রাসার বার্ষিক মাহফিল সহ দেশের আনাচে কানাচে অসংখ্য বার্ষিক মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন।

অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রতিবাদ

নেছারাবাদী (রহ.) সুন্নতে রাসুল প্রতিষ্ঠায় যেমন অপরিসীম চেষ্টা সাধনা করেছেন, তেমনি সুন্নত পরিপন্থী তথা বিদায়াত ও ইসলাম পরিপন্থী কার্যকলাপ উচ্ছেদে করেছেন সর্বাত্মক সংগ্রাম। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

০১. আনন্দ মেলা বন্ধের আন্দোলন

তিনি ১৯৭৮ সালে সরকারি মদদে আনন্দমেলার নামে চরিত্র হননের কার্যকলাপ বন্ধের জন্য আন্দোলন করেন। প্রশাসন কায়েদ সাহেব (রহ.) এর এ আন্দোলন রুখতে ১৪৪ ধারা জারী করলে তিনি তা ভঙ্গ করেন। সরকার তার বিরুদ্ধে হুলিয়া জারী করেন, কিন্তু তিনি দমেননি বরং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তাদের ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।[৪৫]

০২. রমজানের পবিত্রতা রক্ষার আন্দোলন

রমজান মাসের পবিত্রতা রক্ষার্থে নেছারাবাদী (রহ.) জোর আন্দোলন করেন। তখন অনেক স্থানেই দিনের বেলা প্রকাশ্যে হোটেল রেস্তরাগুলো খোলা থাকত। নেছারাবাদী (রহ.) এর বিরুদ্ধে জোড় আন্দোলন করেন। তখন বিবিসি সংবাদ তার এ আন্দোলনের ব্যাপারে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে যে, মাওলানা কায়েদ সাহেব (রহ.) হিন্দুদের জোর করে মুসলমান বানাচ্ছে। কিন্তু এ মিথ্যা সংবাদ তাকে মোটেও অবদমিত করতে পারেনি।

০৩. পর্দা [৪৬] ও শালীনতা আন্দোলন

নেছারাবাদী (রহ.) পর্দার ব্যাপারে অতীব কঠোর ছিলেন। তিনি রাস্তায় রাস্তায় ব্যানার টানিয়ে পর্দাহীনতা ও বেহায়াপনার বিরুদ্ধে সকলকে সাবধান করতেন। তিনি বলেন- "নারীজাতি মায়ের জাতিকে সৃষ্টিকর্তার প্রতি আস্তাহীনা করে স্বাধীনতার মোহে মাঠে নামিয়ে পাশ্চাত্য দেশগুলো যে ভুল করেছে আজ সে ভুলের অনুসারী আমরা। নারী স্বাধীনতার নামে ধর্মীয় আইনকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে স্বেচ্ছাচারিতার পথ উন্মুক্ত করে পাশ্চাত্য দেশগুলো নারী জাতিকে যথেষ্ট ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করেছে। নারী জাতির লজ্জা শরম ও কোমলতা একটি বিশেষ অলংকার আজ তা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নারীগণ সেজেছে ভোগের সহজ পণ্যরূপে। ধর্মীয় চেতনায় উদবুদ্ধ হও- শান্তিময় জীবনের পথে আগাও, বেপর্দেগী বেহায়ায়ী- চলবে না, চলবে না, এই স্লোগান ও সুচিন্তিত কর্ম পদ্ধতি নিয়ে সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই সমাজ থেকে বেপর্দেগী বেহায়ায়ী প্রতিরোধ করতে পারে।"[৪৭]

---

৪৫ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪৬ পর্দা শব্দটি মূলত ফার্সী। পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ- আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, বস্ত্রাদি দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেয়া, আবৃত করা বা গোপন করা ইত্যাদি। পরিভাষায়, নারী-পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, নারী তার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রূপলাবণ্য ও সৌন্দর্য পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে আড়ালে রাখার যে বিশেষ ব্যবস্থা ইসলাম প্রণয়ন করেছে তাকে পর্দা বলা হয়। পর্দা ইসলামের সার্বক্ষণিক পালনীয় অপরিহার্য বিধান। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল প্রমাণাদির ভিত্তিতে নামায, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি বিধানাবলির মতো সুস্পষ্ট এক ফরয বিধান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'যখন তোমরা তাদের নিকট কিছু চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এ বিধান তোমাদের ও তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ'। (সূরা আহযাব: ৫৩)

৪৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
পারিবারিক জীবন

নেছারাবাদী(রহ.) অভাব অনটনের মধ্যে থাকলেও তিনি নিজেকে সুখি মানুষ ভাবতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন–"আল্লাহর মেহেরবাণীতে আমি খুব সুখি জীবন যাপন করছি। পৃথিবীতে যতজন মানুষ খুব শান্তিতে বসবাস করছে তার মধ্যে আমিও একজন।"[৪৮] তিনি আর্থিক দিক দিয়ে খুবই অসচ্ছল ছিলেন। চাকুরি করে যে টাকা পেতেন তা দিয়ে নিজের এবং বড়ো ভাইয়ের সংসার চলত। তার নিজের ঘরে আবার এক ছেলেসহ তার ছোটো বোন থাকত। এরপরও তিনি সর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলতেন পারিবারিক জীবনে আমার চেয়ে সুখি মানুষ খুব কমই আছে। তিনি তার পরিবারে রাসুলে করীম (স.) এর সুন্নতের অনুসরণ করেছেন। তার পারিবারিক খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছেদসহ কোনো ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না। সে সময়ে অভিভাবকগণ অপ্রাপ্ত ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিবাহ দিত। নেছারাবাদী(র.) এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটেছিল। নেছারাবাদী(র.) বয়স যখন ৭/৮ বছর তখন তার পিতা ঝালকাঠি থানার তেরআনা গ্রামের সৈয়দ আফতাব উদ্দিনের মেয়ে মোসা: আছিয়া বেগমের সাথে তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। এ সময়ে তার স্ত্রীর বয়স ছিল ৬ বছর। বিবাহের দুই এক বছর পরই সে স্ত্রী ইন্তেকাল করেন।"[৪৯] তার স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তার বাবা মা সহ সকলেই যখন তাঁকে নিয়ে তার শশুরবাড়ি গেল তখন সকলেই চেষ্টা করেছিল তাকে এক নজর দেখানোর জন্য। কিন্তু তিনি তার স্ত্রীর লাশ দেখতে চাচ্ছিলেন না। সবাই যখন জোড় করে তাঁকে লাশের পাশে নিয়ে গেল তখন তিনি নিজের চোখ বন্ধ করে দু হাত দিয়ে চেপে ধরেছিলেন। ছোটো অবস্থা থেকেই তিনি যে আল্লাহর ওলী ছিল এটা তার লক্ষণ। এরপর তার কর্ম জীবন শুরু হলে অনেক নামী-দামী, ধনী ও সম্পদশালী বিশিষ্ট ব্যক্তি হুজুরের কাছে তাদের কন্যা বিয়ে দেয়ার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। কিন্তু তিনি বলতেন আমি কোনো উচু ও ধনী ঘরের মেয়ে বিয়ে করতে চাই না। আমি একজন পরহেজগার ও দীনদার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই। হুজুর স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারে পাঁচটি বিষয়কে খুব প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

০১. তাকওয়া ও দীনদারী

০২. ইলমে দীন শিক্ষা

---

৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৪৯ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

০৩ হছব ও নছব

০৪. সুরাত

০৫. মাল ও দৌলত।

আল্লাহর মেহেরবানীতে উপরোক্ত গুণাবলির ভিত্তিতেই হুজুর তার সঙ্গীনী নির্বাচন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[৫০]

তিনি ১৯৪৫ সালের শেষের দিকে চাখারের সন্নিকটে সোনাহার নিবাসী বুজুর্গ ব্যক্তিত্ব মাওলানা গিয়াস উদ্দীন সাহেবের দ্বিতীয় কন্যা উম্মুল খায়েরের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।"[৫১] নেছারাবাদী (র.)-এর স্ত্রী একজন নেককার ও পরহেজগার মহিলা ছিলেন এবং উপরোক্ত পাঁচটি বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

পারিবারিক জীবনে তিনি তিন পুত্র ও চার কন্যার জনক। পুত্রদের মধ্যে মো: আ: কুদ্দুস মাত্র ৪ বছর বয়সে, আবু নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদুজ্জামান ২ বছর বয়সে এবং কন্যাদের মধ্যে মোসা: হাফিজা ২.৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৫২]

সন্তান সন্তাদি

১। **মো: আবু নসর মুহাম্মদ ওয়াহীদুজ্জামান** (২ বছরের সময় ইন্তেকাল করেন)।

২। **মোসা: ফাতেমা** (বড়ো মেয়ে):

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ:)-এর বেঁচে থাকা সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো মেয়ের নাম মোসা: ফাতেমা। তিনি ১৯৫৫ সনে নিজ বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খুব মেধাবী ছিলেন। বাল্যকালে তার পিতা মাতার কাছে দীনি শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬৭ সনে রাজাপুর নিবাসী অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মেল হক, রাজাপুরীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার চার ছেলে ও দুই মেয়ে।[৫৩]

৩। **মোসা: খাতুনে জান্নাত** (মেজ মেয়ে):

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)-এর মেজ মেয়ের নাম মোসা: খাতুনে জান্নাত। তিনি ১৯৬০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিও তার পিতা-মাতার কাছে দীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৩

---

৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৫১ মুহিব্বুল্লাহ জামী, দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান (ঢাকা: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, মে,২০০৯), ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ১৪

৫২ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৫৩ গবেষক ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.)-এর বড়ো মেয়ে মোসা: ফাতিমা-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

সালে বাকেরগঞ্জ নিবাসী মাও. মো: আব্দুস সাদেক সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার পাঁচ ছেলে ও ১ মেয়ে।[৫৪]

৪। **মোসা: হাফিজা** (২.৫ বছরের সময় ইন্তেকাল করেন)।

৫। **মো: আ: কুদ্দুস** (৪ বছরের সময় ইন্তেকাল করেন)।

৬। **মোসা: খাদিজা** (ছোটো মেয়ে):

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ:)-এর ছোটো মেয়ের নাম মোসা: খাদিজা । তিনি ১৯৬৫ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ছোটো বেলায়ই তিনি তার পিতা মাতা থেকে দীনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯৮০ সনে হদুয়া দরবার শরীফের তৎকালীন মেঝ শাহ সাহেব, বর্তমান গদ্দিনিশীন পীর মাও. শাহ মো: আবু তৈয়ব সাহেবের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তার ১ ছেলে ও ১ মেয়ে।[৫৫]

৭। **মাও. মুহম্মদ খলীলুর রহমান নেছারাবাদী:**

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (র.)-এর জীবিত সন্তানদের মধ্যে একমাত্র ছেলে মাওলানা খলীলুর রহমান নেছারাবাদী। তিনি ঝালকাঠির নেছারাবাদে ১৯৬৯ সালের ৩০শে ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। দীনের অন্যতম মার্কাজ ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসার আঙ্গিনায়ই কাটে তার শৈশব ও কৈশর। এখানকার মক্তব থেকেই তার শিক্ষার শুরু এবং এখানেই ফাজিল পর্যন্ত অধ্যয়নের পাশাপাশি পিতার পদাঙ্ক অনুসরণে দীনি সাংগঠনিক খেদমতে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় কামিলে অধ্যয়নের পাশাপাশি ছারছীনা শরীফের মরহুম হযরত পীর সাহেব শাহ আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ (রহ:)-এর আন্তরিক ইচ্ছায় ও দোয়ায় জমিয়তে হিযবুল্লাহর কর্মী ও বাংলাদেশ ছাত্র হিজবুল্লাহর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রেখেও কামিলে প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এ সময় তার লিখিত "সংগঠন ও সংগঠনের ফরযিয়াত" শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হলে সর্বত্র সাড়া পড়ে যায়।

১৯৯০ সালের ১লা জানুয়ারি ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসার মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদানের মধ্য দিয়ে তার কর্ম জীবন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ এর ১৮ ডিসেম্বর অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর দলীয় রাজনীতি মুক্ত এ প্রতিষ্ঠান ক্রমান্বয়ে দেশের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে এবং তার ধারাবাহিতা রক্ষা হলে তিনি অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। হযরত

---

৫৪ গবেষক ১৯-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.)-এর মেজ মেয়ে মোসা: খাতুন-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৫৫ গবেষক ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.)-এর ছোটো মেয়ে মোসা: খাদিজা-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ:) যে দায়িত্বভার তার উপর অর্পণ করে গেছেন সেই এক্কামতে দীন ও তাবলীগে দীনের মহান খেদমতের আঞ্জাম দিতে অধ্যক্ষের মতো বিশাল লোভনীয় চাকরি অনায়াসে ছেড়ে দেয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ২০১৫ সালের ৫ ই জানুয়ারি স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।

ব্যক্তিজীবনে ২ কন্যা ও ০১ পুত্র সন্তানের জনক। বর্তমানে তিনি নিরন্তর সফর করছেন দেশের নানান প্রান্তে, নানান জায়গায়, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ১৬ কোটি মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি চিন্তায়।[৫৬]

নেছারাবাদী(রহ.) পারিবারিক জীবনে তার মা, স্ত্রী, ছেলে মেয়েসহ সকলের হক যথাযথ ভাবে আদায় করেছেন। পরিবারের সবাই তার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল।

নেছারাবাদী(রহ.) তার ছেলে মেয়েদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। শিক্ষা-দিক্ষা, বিয়ে-শাদী সবকিছুই সঠিকভাবে পালন করেছেন। আত্মীয় স্বজনদের যথা সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করেছেন। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তিনি কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করতেন না। যার যতটুকু হক সঠিকভাবে আদায় করেছেন।

নেছারাবাদী হুজুর (রহ) সম্পর্কে তার ছেলের সাক্ষাৎকার

গবেষক: আসসালামু আলাইকুম

মাও. খলীলুর রহমান: ওয়ালাইকুম আসসালাম

গবেষক: আমি নেছারাবাদী হুজুর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই

মাও. খলীলুর রহমান: জি, তার জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি তা থেকে আপনাকে জানাতে চেস্টা করব।

গবেষক: হুজুরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর এক সম্ভ্রান্ত প্রখ্যাত আলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মফিজ উদ্দীন (রহ.)। তাঁর পিতা একজন খাঁটি আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল জিনাতুন্নেছা, তিনিও ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ উদার মনের মহিলা। তিনি ১৯৪৩ সনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি পারিবারিক জীবনে একজন সুখি মানুষ ছিলেন। তিনি ছারছীনা মাদ্রাসায় চাকুরি করে খুব অল্প বেতনে তাঁর ও তার বড়ো ভাইয়ের দুটি সংসার চালাতেন। তাঁর তিন ছেলে ও চার মেয়ে ছিল এর মধ্যে দুই ছেলে ও এক মেয়ে ছোটো বেলায়ই ইন্তিকাল করেন।

---

৫৬ গবেষক ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদ কমপ্লেক্স-এর কর্মকর্তা মো: সোলাইমানের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

গবেষক: নেছারাবাদী হুজুর কায়েদ উপাধি পেলেন কিভাবে?

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর (রহ) ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী ও নেতৃত্বের গুণাবলি সম্পন্ন একজন মানুষ। তিনি যেখানেই অবস্থান করেছেন সেখানেই সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন অত্যন্ত সুনামের সাথে। ছারছীনা দরবারে অবস্থানকালীন সময়ে তাঁর ধারাবাহিক কর্মসূচিতে তাঁর পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এতটা খুশি হয়েছিলেন যে, তাকে কায়েদ উপাধি দিয়েছিলেন এবং সবাই তাকে কায়েদ সাহেব নামে ডাকা শুরু করল। এক সময় তার মূল নাম মানুষ ভুলেই গেল। তিনি সকলের কাছে কায়েদ সাহেব নামেই পরিচিত লাভ করলেন।

গবেষক: দীনি শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কী কী অবদান আছে?

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর (রহ.) তাঁর গোটা জিন্দেগীটাই দীন প্রচারের কাজে ব্যয় করেছেন। মানুষকে দীন শিখাতে তিনি অনেকগুলো বই রচনা করেন। প্রতিষ্ঠা করেন বহু আলিয়া, নূরানী ও হাফেজিয়া মাদ্রাসা। এছাড়াও তিনি সারা বছর দেশের সর্বত্র তালিমি জলসা ও মাহফিল করতেন।

গবেষক: শুনেছি তিনি মানুষদের চিকিৎসা করতেন, এ বিষয়ে একটু জানতে চাই।

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর (রহ.) মানষদেরকে বাতেনী তদবীর হিসেবে সকল রোগের জন্যই তৈল, পানি, কালোজিরা ও মধু পড়ে দিতেন এবং দশফান্ডে মান্নত করতে বলতেন। এছাড়াও তিনি বায়োকেমিক চিকিৎসায় পারদর্শি ছিলেন। তাঁর এ চিকিৎসা দ্বারা অনেক লোক উপকৃত হত।

গবেষক: তাঁর ছাত্র জীবন সম্পর্কে একটু জানতে চাই।

মাও. খলীলুর রহমান: তিনি নিজ গ্রামেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। এরপর তিনি ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ভোলা আলিয়া মাদ্রাসায় অধ্যায়নকালে তাঁর প্রখর মেধা ও প্রতিভা দেখে মাদ্রাসার সকলেই তার প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর এক বন্ধে বাড়িতে এসে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লে তখন তার মধ্যে ছারছীনা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এরপর তিনি ছারছীনা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৪০ সনে ফাজিল কেন্দ্রীয় পরীক্ষায় কলকাতা মাদ্রাসা বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান লাভ করেন। তখন ছারছীনা মাদ্রাসায় ফাজিলের উপরে পড়ার ব্যবস্থা না থাকায় তিনি উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন্য কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় কামিল জামাতে ভর্তি হন। সেখান থেকে ভারত বর্ষের শ্রেষ্ঠ আলিমদের সহচর্যে ও সোহবাত নিয়ে ইসলামী শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

গবেষক: রাজনীতি সম্পর্কে হুজুরের চিন্তাধারা কী ছিল?

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর (রহ.) একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবীদ ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিকারী হওয়ার রাজনীতির চেয়ে পরোক্ষ রাজনীতি পছন্দ করতেন। তিনি মনে করতেন রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশ ও জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শণ করতে নিয়মতান্ত্রিক চেস্টা সাধন করা নিঃসন্দেহে তাবলীগে দীনের অন্তর্ভূক্ত।

গবেষক: বর্তমানে অনেক ইসলামী সংগঠন থাকার পরও তিনি কেন মুছলেহীন নামে আলাদা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করলেন?

মাও. খলীলুর রহমান: ছারছীনা থেকে চলে আসার পর তিনি তার চিন্তা, চেতনা ও দর্শন স্বাধীনভাবে বাস্তবায়নের জন্য আরেকটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেন যাতে সে সংগঠনের মাধ্যমে তার চিন্তা, চেতনা ও দর্শন স্বাধীনভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন বিশেষকরে তার যুগান্তকারী মতবাদ 'আল ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ' নীতি বাস্তবায়ন করতে আরেকটি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করেন তাই ১৯৯৭ সনের ৩ জানুয়ারি হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলেহীন নামক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন।

গবেষক: তিনি কয় তরীকায় কামিল ছিলেন?

মাও. খলীলুর রহমান: নেছারাবাদী হুজুর (রহ) ৪ তরীকায় কামিল ছিলেন। তিনি তাঁর পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর নিকট চিশতিয়া, নকশবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া ও তরীকার শিক্ষা নেন এবং কামালিয়াত অর্জন করেন।[৫৭]

৫৭ গবেষক ১৯-০৭-২০১৯খ্রি. তারিখ নিজে নেছারাবাদে উপস্থিত হয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাও: খলীলুর রহমান নেছারাবাদীর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর কর্ম জীবন

নেছারাবাদী (রহ.)-এর কর্মজীবন সত্যিই বিস্ময়কর। তার কর্মজীবন সাধারণ মানুষকে প্রেরণা যোগায় একজন মানুষ একই সাথে এতগুলো গুণের অধিকারী হতে পারে সেটা কল্পনাও করা যায় না। তিনি ছিলেন একজন পীর, সূফী-সাধক, ইসলামী চিন্তাবীদ, দার্শনিক, গবেষক, লেখক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবীদ, সমাজ সেবক, সাংবাদিক ও সু-সংগঠক। তিনি কাজের মাধ্যমে তার যোগ্যতার প্রমাণ করেছিলেন। তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ছারছীনা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা থেকে।[৫৮] শিক্ষকতার পাশাপাশি ইসলাহে নফস (আত্ম শুদ্ধি), ইসলাহে কওম (সমাজ শুদ্ধি), ইসলাহে হুকুমত (রাষ্ট্র শুদ্ধি) এর নিমিত্তে বিভিন্ন ইসলামী ও সামাজিক সংগঠন ও সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা ভিত্তিক দর্শন পেশ করেছেন। বিভিন্ন বিষয় শতাধিক কিতাব প্রণয়ন করেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় সাংবাদিকতা করেছেন। দীনি শিক্ষা বিস্তারে বহু দীনি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দেশের কল্যাণে জাতিতে জাতিতে এবং সকল দেশ প্রেমিক ভাইদের আর ইসলামের স্বার্থে, পীর মাশায়েখ, ওলামায়ে কেরাম ও ইসলামী নেতৃবৃন্দকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তার বিশাল কর্ম জীবনের কার্যক্রমগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা অনেক কষ্ট সাধ্য। এই অভিসন্দর্ভে সাধ্যানুযায়ী তার বিশাল কর্মময় জীবনের কয়েকটি দিক সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যে দিকগুলো ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছে।

শিক্ষকতা

কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ফিরে স্বীয় পীর ও মুরশিদ শাহসূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর পরামর্শে ১৯৪২ সালে সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসায় যোগদান করেন। শিক্ষকতায় তিনি অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। পাঠদানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট বাচন ভঙ্গি ও হৃদয় গ্রাহী আলোচনার কারণে ছাত্ররা সহজেই তার বক্তব্য বুঝতে সক্ষম হত। তিনি ছাত্রদের পড়া লেখার পাশাপাশি নৈতিক চরিত্রে চরিত্রবান ও আদর্শবান হওয়ার লক্ষে তালীম প্রদান করতেন। এক সময় তিনি বোর্ডিং সুপারের দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন

---

৫৮ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

ছারছীনা মাদ্রাসায় ভাইস প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালনের পর ১৯৬৭ সনে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেন।[৫৯]

নেছারাবাদী (রহ.) এর অসংখ্য ছাত্র আজ দেশ বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তার ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, লেখক, রাজনীতিবীদ, গবেষক রয়েছে যারা এখনও দেশ বিদেশে সুখ্যাতি ছড়াচ্ছে।

নেছারাবাদীর উল্লেখযোগ্য ছাত্র -

তিনি তার ছাত্রদেরকে প্রকৃত দীনি শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। তার হাজার হাজার ছাত্র এখন দেশের বিভিন্ন সেক্টরে খেদমত করছে। উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে-

* ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ মাও. আ: রব খান ।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান[৬০]

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. আ র ম আলী হায়দার মুর্শিদী।[৬১]

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক এম এ মালেক।

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মো: ফজলুর রহমান।

---

৫৯ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

৬০ কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান ১৯৪১ সালের ১ জানুয়ারি পিরোজপুরের মঠবাড়িয়া উপজেলার টিকিকাটা ইউনিয়নের সূর্যমণি গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মো: আব্দুল মজিদ মুন্সি ও মাতা লাল বরু বেগম গৃহিনী ছিলেন। ড. মো: মোস্তাফিজুর রহমান বাংলাদেশে প্রথম পবিত্র কুরআন শরীফ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। এছাড়া তিনি আরবী, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় অনেক বই লিখেছেন। ১৯জানুয়ারি ২০১৪ তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬১ বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. এ. আর. এম. আলী হায়দার মুর্শিদী ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ সূফী মৌলভী মোহাম্মদ রাহাতুল্লাহ মিয়া (রহ.) ও মাতা মোসাম্মাৎ যুবায়দা খাতুন (রহ.)। বাড়ির মক্তব দিয়ে তাঁর পড়ালেখার যাত্রা শুরু। তিনি ১৯৫২ খৃ. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদ্রাসায় দাখিল ১ম বর্ষে ভর্তি হন। ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদ্রাসা হতে ১৯৬০ খ্রি. আলিম ও ১৯৬২ খ্রি. ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৬৪ খ্রি. ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাৎ আলিয়া মাদ্রাসা হতে কামিল (হাদীস) বিভাগে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। ১৯৬৬খ্রি. যশোর মাগুরা কলেজ হতে এইচ, এস, সি পরীক্ষা দিয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ১৯৬৯ খ্রি. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ হতে বি, এ (অনার্স) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। বি, এ পরীক্ষায় তিনি কলা অনুষদের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে কালী নারায়ণ স্কলারশীপ লাভ করেন এবং স্বর্ণ পদকে ভূষিত হন । ১৯৭০ খ্রি. একই বিষয়ে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অক্ষুন্ন রেখে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্ম জীবনে তিনি ফেনী ডিগ্রী কলেজে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং সুনামের সাথে চার বছর অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৪ খ্রি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন এ্যারাবিক এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন। জুন ২০১৩ খ্রি. তিনি চাকুরি হতে অবসর গ্রহণ করেন।

*ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আরবী বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান ড. মো. আবদুল কাদির।

*দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান ।[৬২]

*দৈনিক সংগ্রামের সাবেক সম্পাদক মরহুম অধ্যাপক আখতার ফারুক।

সাংবাদিকতা

নেছারাবাদী (রহ.) একজন ভালো সাংবাদিক ছিলেন। দেশ ও জাতির কল্যাণে তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখালেখি করতেন।

বাংলা ১৩৫৭ সালের ১৯ আশ্বিন হযরত মাওলানা শাহসূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) প্রথম পাক্ষিক তাবলীগ পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎকালীন সময় দেশে ইসলামী পত্রিকা ছিল না বললেই চলে।[৬৩]

শুরু থেকেই এ পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন নেছারাবাদী (রহ.)। ১৯৭০ সালে তারই সম্পাদনায় ঢাকা থেকে সাপ্তাহিক ইশায়াত নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। [৬৪]

সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ

নেছারাবাদী (রহ.) অত্যন্ত সাংস্কৃতিকমনা ছিলেন। আল্লাহর ওলীরাও যে, সাংস্কৃতিকমনা হয় এটা পাওয়া দুস্কর। তিনি সব ধর্মের লেখকদের লেখা পড়তেন। তিনি আরবী, বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও ফার্সি ভাষা ভালো করে জানতেন। তিনি বিভিন্ন ভাষার লেখকদের সাহিত্য কর্ম নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ফররুখ আহম্মেদ, কায়কোবাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ফার্সি সাহিত্যের আল্লামা

---

৬২ মাওলানা রুহুল আমীন খানের পৈত্রিক ভূমি পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জ থানাধীন চৈতা গ্রামে এবং সেখানে তিনি ১৯৪২ সালের ১২ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ির মাদ্রাসায় শুরু হয় এবং সেখানে থেকে আলেম পাস করার পর তিনি দারুচ্ছুন্নাত ছারছীনা আলিয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৬৬ সালে টাইটেল পাস করেন। এরপর রুহুল আমীন খান সাহেব আধুনিক শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনের সূচনা করেন সেই ছারছীনা মাদ্রাসায় অধ্যাপনার মাধ্যমে। এ সময় তিনি সাংবাদিকতার সাথেও যুক্ত হন। যেহেতু তিনি কিশোর বয়স থেকেই লেখালেখি করে আসছিলেন, তাই মরহুম পীর মাওলানা নেছার উদ্দীন (রহ.) প্রতিষ্ঠিত বাংলা 'পাক্ষিক তাবলীগ' তাকে সাংবাদিকতার পথে অগ্রসর হতে সহায়ক হয়, তাকে এ পত্রিকার সম্পাদনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অধ্যাপনার পাশাপাশি তার সাংবাদিকতার সূচনা এখানেই। তিনি দেশের প্রথম শ্রেণির অত্যাধুনিক দৈনিক পত্রিকা ইনকিলাবের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় প্রবেশের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চা এবং কবিতা রচনাকে এগিয়ে নিতে থাকেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম হওয়ায় আরবি, ফারসি ও উর্দু সাহিত্যও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করতে থাকেন। তাদের কবিতার প্রভাবও রহুল আমীন সাহেবের কথা ও কবিতায় প্রতিফলিত।

৬৩ অধ্যক্ষ আলহাজ্ব মোঃ ইসমাইল হোসেন, বীর মুজাহিদ পীর শাহ মোঃ ছালেহ (রহ.) (পিরোজপুরঃ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ২০০৫), ১ম সংস্করণ, পৃ. ৬৩

৬৪ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

ইকবাল,[৬৫] শায়েখ ফরিদ উদ্দিন আক্তার,[৬৬] আগা হাশর কাশ্মিরী,[৬৭] মাওলানা রুমী,[৬৮] আঃ রহমান জামী[৬৯] এদের লেখা নিয়ে গবেষণা করতেন এবং এদের বিভিন্ন সামাজিক সংগীতগুলো

---

৬৫ তার নাম মুহাম্মদ ইকবাল হলেও তিনি আল্লামা ইকবাল হিসেবেই অধিক পরিচিত। তিনি ৯ নভেম্বর ১৮৭৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিভাগপূর্ব ভারতবর্ষের মুসলিম কবি, দার্শনিক এবং রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ ও ব্যারিস্টার ছিলেন। তার ফার্সি ও উর্দু কবিতা আধুনিক যুগের ফার্সি ও উর্দু সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইকবাল তার ধর্মীয় ও ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের জন্যও বিশেষভাবে সমাদৃত ছিলেন। ইকবাল ভারতীয়, পাকিস্তানি, ইরানিয়ান এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি হিসাবে প্রশংসিত। যদিও ইকবাল বিশিষ্ট কবি হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত, তিনি 'আধুনিক সময়ের মুসলিম দার্শনিক চিন্তাবিদ' হিসাবেও অত্যন্ত প্রশংসিত। ১৯২২ সালের নিউ ইয়ার্স অনার্সে তাকে রাজা পঞ্চম জর্জ তাকে নাইট ব্যাচেলর এ ভূষিত হয়েছিল। দক্ষিণ এশিয়া ও উর্দু-ভাষী বিশ্বের বেশিরভাগ অঞ্চলে ইকবালকে শায়র-ই-মাশরিক (প্রাচ্যের কবি) হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তার ফার্সি সৃজনশীলতার জন্য ইরানেও তিনি ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ, তিনি ইরানে ইকবাল-ই-লাহোরী নামে পরিচিত। ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল তিনি মৃত্যু বরণ করেন।

৬৬ শায়েখ ফরিদ উদ্দিন আক্তার হিজরী ৫৪০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন একজন ওষুধ বিক্রেতা। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ওষুধ বিক্রিকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন। পেশাগত কারণেই তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেন। কথিত আছে যে প্রতিদিন তার কাছে অন্তত ৫০০ জন রোগী আসতেন। রোগীদের তিনি তার নিজের তৈরি ওষুধ দিতেন। ফরিদ উদ্দিন আক্তার অন্তত ৩০ টি বই লিখে গেছেন। তার একটি বিখ্যাত বই হচ্ছে 'মানতিকে তাইয়ার' বা 'পাখির সমাবেশ'। আক্তারের কবিতা রুমিসহ বহু আধ্যাত্মিক কবির জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তিনি কিছু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে দীর্ঘ দিন বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তিনি গবেষণার মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জন করেন, তা কবিতার আকারে লিখে গেছেন। হিজরী ৮১১ সালে ইরানের এই বিখ্যাত কবি মোঙ্গলদের হামলার সময় মৃত্যু বরণ করেন। ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নিশাপুর শহরে তার কবরস্থান রয়েছে।

৬৭ আগা হাশর কাশ্মিরী ১৮৭৯ সালের ৩ এপ্রিল জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন উর্দু কবি ও নাট্যকার ছিলেন। তার মঞ্চ নাটকের প্রতি খুব আগ্রহ ছিল তাই ১৮ বছর বয়সে বোম্বেতে পাড়ি জমান এবং নাট্যকার হিসাবে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। আগা হাশর কাশ্মিরির প্রথম নাটক আফতাব-এ-মুহাব্বাত ১৮৯৭ সালে প্রকাশ হয়। তিনি বোম্বেতে নিউ আলফ্রেড থিয়েটারিকাল কোম্পানির নাট্য লেখক হিসাবে তার পেশাগত জীবন শুরু করেন মাত্র ১৫০০০ টাকা বেতনে। ১৯১৩ সালে প্রকাশিত ইয়াহুদি কি লাডকি (একজন ইহুদীর কন্যা) তার সর্বাধিক পরিচিত রচনা হয়ে ওঠে। কাশ্মিরি ১৯৩৫ সালের ২৮ এপ্রিল ব্রিটিশ ভারতের লাহরে মারা যান।

৬৮ জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ রুমি সেপ্টেম্বর ১২০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ বালখী, মাওলানা রুমি, মৌলভি রুমি ও শুধু মাত্র রুমি নামেও পরিচিত। তিনি একজন ফার্সি সুন্নি মুসলিম কবি, আইনজ্ঞ, ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ধর্মতাত্ত্বিক এবং সুফী ছিলেন। তার প্রভাব দেশের সীমানা এবং জাতিগত পরিমণ্ডল ছাড়িয়ে বিশ্ব দরবারে ছড়িয়ে আছে। তাজাকিস্তান, তুর্কি, গ্রিক, পশতুন, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়ার মুসলামানরা বিগত সাত শতক ধরে বেশ ভালোভাবেই তার আধ্যাত্মিকতাকে যথাযথভাবে সমাদৃত করে আসছে। তার কবিতা সারাবিশ্বে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিভিন্ন ধারায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। রুমিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'সবচেয়ে জনপ্রিয় কবি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। রুমির সাহিত্যকর্ম বেশিরভাগই ফার্সি ভাষায় রচিত হলেও তিনি তুর্কি, আরবী এবং গ্রিক ভাষায়ও লেখালেখি করেছেন। তার লেখা মসনবী-কে ফার্সি ভাষায় লেখা সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। বৃহত্তর ইরান এবং বিশ্বের ফার্সি ভাষী জনগোষ্ঠী এখনও তার লেখাগুলো মূল ভাষায় ব্যাপকভাবে পড়ে থাকে। অনুবাদসমূহও খুব জনপ্রিয়, বিশেষ করে তুরস্ক, আজারবাইজান, যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ এশিয়ায়। তার কবিতা ফার্সি সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে, শুধু তাই নয় তুর্কি সাহিত্য, উসমানীয় তুর্কি সাহিত্য, আজারবাইজানি সাহিত্য, পাঞ্জাবের কবিতা, হিন্দী সাহিত্য, উর্দু সাহিত্যকেও অনেক প্রভাবিত করেছে। এছাড়াও অন্যান্য ভাষার সাহিত্য যেমন তুর্কীয়, ইরানীয়, ইন্দো-আর্য, চাগাতাই, পশতু এবং বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে।

৬৯ নূর আদ-দীন আবদুর রহমান জামী , মাওলানা নূর আল-দীন আবদুর রহমান বা সাধারণভাবে জামি বা তুর্কি ভাষায় মোল্লা জামি নামে পরিচিত। জামি ১৪১৪ সালের ৭ নভেম্বর খোরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। জামির জন্মের

চর্চা করতেন। আল্লামা ইকবাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহু সংগীত তিনি নিজ কণ্ঠে গাইতেন। এমনকি ইংরেজী সাহিত্যের সেক্সপিয়ার ও হোমারের লেখাও তিনি পড়তেন এবং পছন্দ করতেন। নকুল কুমার বিশ্বাস এর সমাজ সংস্কার মূলক সংগীতগুলো তার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি সাংস্কৃতিক মনা ছিলেন। তাই তিনি মনে করতেন সমাজের অশ্লীল নাটক, ছিনেমা বন্ধ করতে হলে এর বিকল্প ভালো নাটক মানুষের মাঝে দিতে হবে। তাই তার নিজ বাড়িতে বিভিন্ন সময় নাটকের আয়োজন করতেন। তিনি বুঝাতে চাইতেন ভালো নাটকের মাধ্যমে মানুষকে ভালো কিছু দেয়া সম্ভব। দেখা যেত এতে কিছু মানুষ তার সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে বলতেন সাংস্কৃতির অঙ্গণে ভালো কিছু না দিয়ে অপ-সাংস্কৃতির হাত থেকে জাতিকে বাচানোর চেষ্টা একেবারেই অনর্থক।[৭০]

কায়েদ উপাধি লাভ

একজন নেতার সমস্ত গুণাগুণই নেছারাবাদী (রহ.) এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। ছোটো বেলা থেকেই তার মধ্যে নেতৃত্বের গুণ পরিলক্ষিত হয়।

এই সময়ে তরুণ আজীজের ধারাবাহিক কর্মসূচি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে খুশি হয়ে স্বীয় মুর্শিদ নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) তাকে কায়েদ সাহেব অভিধায় ভূষিত করেন। পীর নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) বলতেন-"আমার কায়েদ বিশ্ব জয় করবে ইনশাআল্লাহ।"[৭১] কায়েদ সাহেব উপাধিটা এতটাই পরিচিতি পেয়েছিল যে, মানুষ তার আসল নামই ভুলে গেছে।

কয়েক বছর পরে তাদের পরিবার হেরাতে চলে যান এবং সেখানে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়য়ে গণিত, ফার্সি সাহিত্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, আরবী ভাষা, যুক্তি এবং ইসলামী দর্শন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান শিক্ষা কেন্দ্র সমরখন্দে যান এবং তার শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি একটি তীর্থে অবস্থান করেন, যেখানে তার খ্যাতি বৃদ্ধি পায় এবং পারস্যে তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। জামি ১৪৫৩ সালে সুফি শায়খ হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি সুফি পথের উপর একাধিক পাঠের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি সুফিদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করেন। জামি তার অত্যাধিক ধর্মনিষ্ঠা ও রহস্যের জন্য পরিচিত। তিনি বাল্যকালে খাজা মোহাম্মদ পার্সা যখন তাদের শহরে আসেন তখন তার আশীর্বাদ পাওয়ার পর সুফিবাদের আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তিনি সামাজিক রীতি-নীতি পালনে উদাসীন ছিলেন।

৭০ গবেষক ২২-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত স্বাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) এর বড় মেয়ের বড় ছেলে মো: ছাইফুল হক ইছলাহীর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৭১ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রে নেছারাবাদীর অবদান

নেছারাবাদী (রহ.)-এর একটি প্রধান আন্দোলন ছিল মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি। সারাটা জীবন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের হারানো গৌরব ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নাই। তার জীবনী পর্যালোচনা করলে আমরা পাই তিনি সার্বজনীন ঐক্য চেয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের স্বার্থে সকল কলেমাওয়ালা মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য। আবার নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আস্তিকদের ঐক্য। দেশের স্বার্থে সকল দেশ প্রেমিকদের ঐক্য। আবার আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার স্বার্থে সকল জাতির মধ্যে ঐক্য। তিনি শুধু মৌখিক ভাবেই ঐক্যের কথা বলেন নি। বরং তিনি এর জন্য চমৎকার একটি থিউরি দিয়ে গেছেন যার ভিত্তিতে সকল মানুষের মধ্যে ঐক্য হওয়া সম্ভব। তা হচ্ছে "আল ইত্তেহাদ মা'য়াল ইখতেলাফ (মতানৈক্যসহ ঐক্য)।" অর্থাৎ খুঁটিনাটি বিষয়ে মত পার্থক্যসহ সার্বজনীন বিষয়গুলোতে ঐক্য। তিনি বলেন-"জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় পৃথক সত্তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য জাতীয় ঐক্যের যেমন প্রয়োজন, তেমনি জাতিতে জাতিতে ঐক্যের প্রয়োজন আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য।"[৭২]

ঐক্যের চেষ্টা

নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য থাকা ওয়াজিব। তাই এই ওয়াজিবকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি ছাত্র জীবন থেকেই চেষ্টা করেছিলেন। পীরে কামেল নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর প্রধান খলিফা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কাউকে মুরীদ করতেন না। জীবনের শেষে এসে কিছু লোককে মুরীদ করেছিলেন একান্ত অনুপায় হয়ে, তিনি মনে করতেন, তিনি যেহেতু ছাত্র জীবন থেকে ওলামা মাশায়েখকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছেন। সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র কোন ছেলছেলা জারী করলে তা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে মনে করে কাউকে মুরীদ করতেন না। কিন্তু কিছু লোক এমন রয়েছে যারা কেবল তারই নিকট মুরীদ হতে চায়। তিনি মুরীদ না করলে তারা অন্য কারো নিকট মুরীদ হবে না। আর তিনি যে, তাহরীক চালাচ্ছে তা সফল করতে এ ধরনের ফেদা লোক অপরিহার্য, তাই জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি তার মাশায়েখদের নিকট হতে যা

---

৭২ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নভেম্বর,২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ৮

শিখেছে তা অন্যকে বাতিয়ে যাওয়া আবশ্যক মনে করে কিছু বাইয়াত করেছিলেন।[৭৩] ঐক্য প্রচেষ্টা যাতে সফল হয় এজন্য তিনি অনেকগুলো মহা সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশের বরেণ্য পীর মাশায়েখ ও ওলামায়ে কেরাম।

ঐক্য সম্মেলন–১৯৭০

নেছারাবাদী (রহ.) মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য ১৯৭০ সালে ঝালকাঠি স্টেডিয়ামে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ও ওলামা মাশায়েখের সমন্বয়ে ঐক্য সম্মেলনের আয়োজন করেন।[৭৪] এরপর তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করে গেছেন।

ঐক্য সম্মেলন–১৯৯৭

১৯৯৭ সনের ২ ফেব্রুয়ারি নেছারাবাদী (রহ.) তার নিজ বাড়িতে সর্বদলীয় ইসলামী মহা সম্মেলনের আহ্বান করেন। দেশের সর্বস্তরের ইসলাম পন্থীদের মধ্যে যাতে করে ঐক্যের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন করা যায় এজন্য একটি কমিটি গঠন করা হয় যে কমিটিতে ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় অনেক পীর মাশায়েখ ও আলেমগণ। তারা সকলেই সেদিন নেছারাবাদী (রহ.)-এর প্রদত্ত মতবাদ "আল ইত্তেহাদ মা'য়াল ইখতেলাফ" গ্রহণ করেছিলেন। তারা এটাকে খুব বাস্তব ভিত্তিক পরিভাষা গ্রহণ করেছিলেন। কেননা সব ধরণের মত পার্থক্য মিটিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। অথচ দীনের মহান স্বার্থে ঐক্য প্রয়োজন। ঝালকাঠিতে অনুষ্ঠিত ১ম বৈঠকের পর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে উক্ত কমিটির আরো বৈঠক হয়।

ঐক্য সম্মেলন ১৯৯৮

১৯৯৭ সালে একটি সফল বছর পার করার পর ১৯৯৮ সালে আরেকটি সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন সম্পর্কে তিনি বলেন–"আমি ১৯৫২ খ্রি. থেকে "আল ইত্তেহাদ মা'য়াল ইখতেলাফ" তথা মতানৈক্যসহ ঐক্য-এর ভিত্তিতে ইসলাম পন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার দাওয়াত দিয়ে আসছি। এ উদ্দেশ্যে কয়েকবার সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন আহবান করেছি। তবে ধারণাতীত সাড়া পেলেও এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে পূর্ণ সফলতা লাভ করতে পেরেছি বলে মনে হয় না। এ জন্য আমার মনে সামান্যতম দুঃখ বা কষ্টও নেই। কেননা আমিতো শুধু আল্লাহর রেযামন্দি লাভের জন্যই মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। সফলতা ও বিফলতা আমার দেখার বিষয় নয়। তাতো আল্লাহর হাতে। আমি

---

৭৩ তরীকাই ছুন্নিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

৭৪ এই সেই ঝালকাঠি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

আমার নিয়ত ও চেষ্টা অনুযায়ী প্রতিদান আল্লাহর কাছে পাব, ইনশাআল্লাহ। তবে এখনো যে আমাদের মধ্যে কিছুটা ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।"[৭৫] সম্মেলনের ভাষণে তিনি বলেন: "দ্বীন রক্ষার বৃহত্তম স্বার্থে আজ মুসলমানদের যেমন ঐক্যের প্রয়োজন, তেমনি দেশ জাতির স্বার্থে দল-মত-নির্বিশেষে সকল দেশ প্রেমিমের ঐক্যবদ্ধ হওয়া অত্যাবশ্যক। তিনি তাঁর ভাষণে ইত্তেহাদ মা'আল ইখতেলাফ তথা মতানৈক্যসহ ঐক্যের নীতিতে সকল মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধভাবে ইসলামের খেদমত করার উদাত্ত আহ্বান জানান।

জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠনে পৃষ্ঠপোষকতা

দেশের ৬৩ জন খ্যাতনামা আলেম ১৯৯৮ সালের ১৮ নভেম্বর ঐক্যের পক্ষে এক যৌথ বিবৃতি দেন যা ঐ দিন জাতীয় দৈনিক গুলোতে প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই হযরত নেছারাবাদী (রহ.) এর নেতৃত্বে ফুরফুরা দরবার শরীফে মারকাযে ইশাআতে ইসলাম মিরপুরে উক্ত ৬৩ জন আলেমকে নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর সভাপতিত্বে জাতীয় শরীয়াহ কাউন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কাউন্সিল ঐক্যের মূলনীতি হিসেবে নেছারাবাদী (রহ.) এর "ইত্তেহাদ মা'য়াল ইখতেলাফ" পরিভাষাটিই গ্রহণ করেন।

জালালী হালত

নেছারাবাদী (রহ.) এর মধ্যে দুটি হালত ছিল–(১) জালালিয়াত (২) সালেকিয়াত। সালেকিয়াত বলতে আমরা বুঝি সাধারণ অবস্থা এবং জালালিয়াত বলতে বুঝি তার জজবা অবস্থা। সাধারণ মানুষের কাছে এটা জজবা হালত নামেই পরিচিত ছিল। তিনি তার জজবা অবস্থা সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে বুঝানোর জন্য বলেছিলেন– "কোনো চিকন পাইপের মধ্য দিয়া যদি তার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত পানি প্রবাহিত করা হয় তাহলে সে পাইপটি নিশ্চয়ই থরথর করে কাঁপতে থাকবে। ঠিক সেইভাবে কোনো মুমিন বান্দার কলবে তার ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত নূর পতিত হলে সে মুমিন বান্দাও আর স্থির থাকতে পারেন না। আমার জজবার অবস্থাও ঠিক তাই।"[৭৬] জজবার হালতে নেছারাবাদী (রহ.) এর মধ্যে এক কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হত। সারারাত ইবাদাত বন্দেগীর মধ্যে ওয়াজ নসিহত আর দিনে আলোচনা, সেমিনার ও গবেষণার মধ্যে দিয়ে কাটাতেন, তার ঘুম, খাওয়া এদিকে কোন খেয়াল থাকত

---

৭৫ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৭৬ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

না। শরীয়াত ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে এসময় খুব বেশি সোচ্চার থাকতেন। বিভিন্ন রকম কর্মসূচিতে তার দিন পার হয়ে যেত একটু সময়ও তিনি বিশ্রাম নিতেন না।

এ সময়ে নিজের দিকে কোন খেয়াল রাখতেন না। কখন খেয়েছেন, কখন ঘুমিয়েছেন তা ভুলে যেতেন। তবে এ অবস্থায়ও তার কোন মোস্তাহাব আমলও ছুটছে তা কেউ দেখেননি। জজবার সময় তিনি তাহাজ্জুদের ওয়াক্তে সবাইকে ডেকে তুলতেন। "জজবার সময় হুজুর কোন অন্যায় অপরাধের কথা শুনলে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যেতেন। অপরাধকারী যেই হোক তিনি তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এলাকার চেয়ারম্যান-মেম্বার কাউকেই হুজুর ভয় করতেন না। কাউকেই ছাড় দিয়ে কথা বলতেন না। অপরাধী যেই হোক তিনি তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতেন। এসময়ে তিনি কোন বানোয়াট বাজে কথা শুনতে পারতেন না।[৭৭]

৭৭ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়
দীনি শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর অবদান

প্রথম পরিচ্ছেদ
ইসলামী কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা

নেছারাবাদী (রহ.) একটি পরিকল্পিত সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে এবং ইসলামের সঠিক শিক্ষা সকল মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়ার জন্য ১৯৫৬ সনে নিজ বাড়িতে ছোটো-বড়ো ৪২টি প্রতিষ্ঠান নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স। বাংলাদেশে ইসলামের বিশুদ্ধতম কেন্দ্রভূমি এসব প্রতিষ্ঠান দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। কমপ্লেক্স এর প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম–

১। ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসা

নেছারাবাদী (রহ.) সব সময়ই চিন্তা করতেন কীভাবে মানুষের মধ্যে দীনি শিক্ষার প্রসার ঘটানো যায়। কিভাবে মানুষকে সঠিক পথের দিশা দেয়া যায়। আর তখন বাসন্ডা গ্রামে কোন দীনি প্রতিষ্ঠান ছিলনা। এজন্য তিনি ১৯৫৬ সালে নিজবাড়িতে একখানা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম দিকে এ মাদ্রাসা ছোট্টরূপে আরম্ভ হয়।[৭৮]

মাদ্রাসাটি দাখিল মঞ্জুরী পায় ১৯৬১ সালে, আলিম ১৯৬৬ সালে, ফাজিল পায় ১৯৭১ সালে, কামিল পায় ১৯৮৬ সালে। বর্তমানে মাদ্রাসায় হাদীস, তাফসীর, আদব ও ফিকাহ বিভাগ চালু আছে এবং আল কুরআন ও আল হাদীস বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু আছে। নেছারাবাদী (রহ.) একান্ত বৈঠকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বলতে গিয়ে বলেছেন-"নতুন বাড়িতে এসে নিয়ত করলাম একখানা মাদ্রাসা করার। যাতে এলাকার ছোটো-ছোটো ছেলে মেয়েরা কুরআন শিখতে পারে। আমাদের এখানে তখন কোন মক্তব ছিল না। ২/১টি পাঠশালা ছিল। তাতে কুরআন শিক্ষার তেমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। সৈয়দ নূরুল হক ও তার শ্বশুর মরহুম হাজী আব্দুল গনি সাহেব দু'জনে মিলে মাদ্রাসা করার জন্য একখণ্ড জমি কিনে দিলেন। সে জমিতেই মাদ্রাসা করার সিদ্ধান্ত নিলাম, এলাকার লোকজনের এ ব্যাপারে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। কম বেশি অনেকেরই আমি একাজে সহযোগিতা পেয়েছি। জমি ভরাট করে

৭৮ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

ভিটি বাঁধার ব্যবস্থা করলাম। পরে সবার পরামর্শ অনুযায়ী সেখানে (বর্তমানে দক্ষিণ দিকের পশ্চিমপার্শ্বে সেখানে মাদ্রাসা ভবন রয়েছে) একখানা কাঠের ঘর উঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। ঘরের জন্য কাঠ সংগহ করা হল। মিস্ত্রি ঠিক করা হলো। একদিন সকাল বেলা ঘরের কাচ (ঘর তৈরির মূল ফ্রেম) দাঁড় করানোর জন্য তারিখ নির্ধারণ করা হলো। তারিখটি ঠিক আমার মনে পরছে না। সে সময়ে নতুন ঘরের কাচ দাঁড় করানোর দিন মিলাদের ব্যবস্থা হত। সবাই একত্রিত হত। মিলাদের অনুষ্ঠানে তাবারকের ব্যবস্থা করা হত। মিলাদ শেষ সবাই মিলে আল্লাহু আকবর ধ্বনির মাধ্যমে কাচ দাঁড় করাতো। এ প্রচলনটি এখনও আছে তবে সে সময় এটির গুরুত্ব দেয়া হত বেশি। যাই হোক সবাইকে দাওয়াত দেয়া হলো নতুন মাদ্রাসার কাচ দাঁড় করানোর জন্য। অনুষ্ঠানে এলাকার অনেকেই উপস্থিত হলেন। এ সময় আমার ছোটো বেলার দোস্ত দারাজ উদ্দীন সাহেব মাদ্রাসার সামনের রাস্তা দিয়ে ঝালকাঠি যাচ্ছিলেন, আমার বড়ো ভাই মৌলভী লুৎফর রহমান সাহেব কাচ ধরার জন্য ডাক দিলেন। তিনি বললেন, কায়েদ সাহেব যদি এ মাদ্রাসা আল্লাহর জন্যই করে থাকেন তবে এ ঘরের কাচ এমনেই জাগবে। তবে তার এ কথাটা আমার অন্তরে খুব রেখাপাত করছিল। আমি সে মীলাদের অনুষ্ঠানে আল্লাহ তায়ালার কাছে এ দোয়াই করছিলাম। হে আল্লাহ এ মাদ্রাসা, মক্তব যদি আপনার জন্যই করে থাকি তবে কেয়ামত পর্যন্ত যেন এর খেদমত জারি থাকে। হে আল্লাহ আপনি মাদ্রাসাটিকে দীনের মারকায হিসেবে কবুল করুন। আজ মনে পড়ে আমার দোস্তের কথা তিনি সেদিন যে মনে করেই হোক একটি অতি সত্য কথা বলেছিলেন। সেই মক্তব ঘর থেকেই আজকের এই প্রতিষ্ঠান।”[৭৯]

(২) জিনাতুননেছা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা

নেছারাবাদী (রহ.) পুরুষদের পাশাপাশি এ দেশে নারী সমাজকে কীভাবে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায় এ চেষ্টা আজীবন করে গেছেন। নারীদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি খুব আন্তরিক ছিলেন। তিনি তার নিজ বাড়ির পিছনে ১৯৭৮ সনে মহিলাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ফোরকানিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। যার শিক্ষিকা হিসেবে তার আপন ছোটো বোনকে নিয়োগ দেন। এটি তার মায়ের নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তার মা জিনাতুন্নেছার নামে প্রতিষ্ঠিত জিনাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসাটি বর্তমানে ফাজিল পর্যায়ে উন্নীত। এটি প্রথমে ফোরকানিয়া দিয়ে শুরু হয়। দাখিল মঞ্জুরী পায় ১৯৯৬ খ্রি.। আলিম মঞ্জুরী পায় ২০০৩ খ্রি.। ফাজিল মঞ্জুরী পায় ২০১৭ খ্রি.। মাদ্রাসাটি সম্পূর্ণ মহিলা শিক্ষিকা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এবং অনেক ছাত্রী দীনি

৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

শিক্ষা গ্রহণ করে বের হচ্ছে। এর অনুকরণে বর্তমানে অনেক মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা হয়েছে।[৮০]

(৩) কারিগরি বিদ্যালয়

নেছারাবাদী (রহ.) সব সময় চিন্তা করতেন মাদ্রাসার ছাত্ররা দীনি শিক্ষা গ্রহণ করে যাতে বেকার না থাকে এজন্য তিনি নিজ বাড়িতে ১টি কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেয় হয়।[৮১]

(৪) হিযবুল্লাহ দারুল কাজ্বা (সালিশী ব্যবস্থা)

নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন বিচারের দীর্ঘ সূত্রতা অবিচারের শামিল।[৮২] তিনি সমাজে সুবিচার প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম্য অসহায় লোকদের আইনী দীর্ঘসূত্রতা দূর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। গ্রামের অনেক অসহায় গরীব লোক তার কাছে এসে অভিযোগ পেশ করত। ব্যক্তিগত সমস্যা, পারিবারিক সমস্যা, জায়গা জমি সংক্রান্ত জটিলতা এবং ঝগড়া বিবাদসহ বহু ব্যাপারে হুজুরের কাছে এসে তারা বিচার দিত। হুজুর এ সব সমস্যা সমাধানে ও সুষ্ঠ ফয়সালার বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে ১৯৬০ সালে দারুল কাজা নামক একটি সালিশী সংস্থা কায়েম করেন। এখানে বাদী বিবাদী উভয় পক্ষকে হাজির করে তাদের সম্মতিতে সন্তোষজনক সমাধান দেয়া হত।[৮৩]

(৫) হিযবুল্লাহ দারুল আফকার (গবেষণা বিভাগ)

নেছারাবাদী (রহ.) সকল বিষয় নিয়েই গবেষণা করতেন। তিনি মনে করতেন–চিন্তা ফিকির ও গবেষণার সম্পর্ক মস্তিস্কের সাথে। যতদিন পর্যন্ত আমাদের সমাজের মানুষের এই সম্পর্ক ঠিক ছিল ততদিন আমরাই ছিলাম দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ গবেষক ও দার্শনিক। পরবর্তীকালে চিন্তা-ফিকির ও গবেষণার সম্পর্কে দেমাগ (মস্তিস্ক) হতে বিচ্ছিন্ন করে মোরাকাবার নামে কলবের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। ফলে কলবে ভালো ইঞ্জিন লাগানো হয়েছে। এর ফলে বহু লোক মজযুব ও বিদায়াত ফকীরে পরিণত হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে চিন্তা ও গবেষণার দ্বার রুদ্ধ হয়েছে। ফলে আজ আমাদের সমাজে চিন্তাবিদ গবেষক ও মুজতাহিদ সৃষ্টি হচ্ছে না। তাই

---

৮০ গবেষক ২২-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওঃ এসহাক আমীনের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৮১ গবেষক ০২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মাদ্রাসার কারিগরি বিদ্যালয় এর পরিচালক মো: আ: হান্নানের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৮২ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, দুর্নীতির সংজ্ঞা ও উহা দমনের কর্মসূচি (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নভেম্বর, ১৯৮১), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ১১

৮৩ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.), জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

আমি মনে করি এ ভ্রান্তির অবসান হওয়া উচিত। আর এজন্য তিনি নেছারাবাদে প্রতিষ্ঠা করেন হিযবুল্লাহ দারুল আফকার।

(৬) হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ

নেছারাবাদী (রহ.) তার নিজের লিখিত পুস্তকসহ বহু ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছেন। আর এই বইগুলো প্রকাশ করার জন্য তিনি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ। এ প্রকাশনীর মাধ্যমে হুজুর বহু দীনি কিতাব প্রকাশ করেন।

(৭) হিযবুল্লাহ দারুল ইফতা

নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন মাসয়ালা দেয়ার যোগ্যতা রাখেন শুধুমাত্র মুফতী সাহেবগণ। সমাজের সকলের মাসয়ালা দেয়া ঠিক না। তাই তিনি সঠিক মাসয়ালা প্রদানের জন্য বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মুফতীদের সমন্বয়ে ১৯৭৫ প্রতিষ্ঠা করেন দারুল ইফতা (ফতোয়া বিভাগ)।

(৮) ভেষজ চিকিৎসা বোর্ড ও স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা

নেছারাবাদী (রহ.) হোমিওপ্যাথিক ও বায়োকেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ছারছীনা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করার সময় প্রথমে হোমিওপ্যাথিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু হোমিওপ্যাথিকে অত্যাধিক এলকোহল থাকায় পরে বায়োকেমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বায়োকেমিক চিকিৎসায় তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেছিলেন। এরপর তিনি ভেষজ চিকিৎসা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি মনে করতেন মানুষের রোগের চিকিৎসা গাছের মধ্যেই বিদ্যমান। এ চিকিৎসায় তিনি সকলকে উৎসাহ যোগাতেন এবং সকলকে গাছের গুণাগুণ শিক্ষা দিতেন। নিজে একটি ভেষজের বাগান তৈরি করেছিলেন। ভেষজ গবেষণার এক উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন চায়ের বিকল্প জোশান্দায়ে আযীযী।[৮৪] তিনি নিজ বাড়িতে একটি স্বাস্থ্য গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তার এ প্রতিষ্ঠানটি হাসপাতালে রুপান্তরিত হয়েছে। সেখানে প্রতি শুক্রবার নারী ও শিশুদের এবং প্রতি রবিবার পুরুষদের ফ্রী চিকিৎসা সেবা দেয়া হয়।

(৯) কুটির শিল্প

নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন দরিদ্র এই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে কুটির শিল্পের উন্নতি ঘটাতে হবে। তাই তিনি মহিলাদের পর্দা সহকারে এ কাজে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করেন।

---

৮৪ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

"টুপি, সাজি, শীতল পাটি, খাড়াই, ইত্যাদি তৈরি করার জন্য মহিলা ও পুরুষ সকলকে উৎসাহিত করতেন। বিধবা ও গরীব মহিলারা যা তৈরি করতেন তা তিনি নিজে বাজারে বিক্রির ব্যবস্থা করে লভ্যাংশসহ ফেরত দিতেন।"[৮৫]

(১০) এমদাদ ফাণ্ড গঠন

হযরত নেছারাবাদী হুজুর (রহ.) ছিলেন আদর্শ সামাজ সেবক। তিনি সর্বদা কিভাবে, মানুষের উপকার করা যায় এই চিন্তা করতেন। সমাজের এতিম, অসহয় গরীব-দুঃখিদের সাহায্যে তিনি সব সময় এগিয়ে আসতেন যার কারণে তিনি গঠন করেছিলেন এমদাদ ফাণ্ড। যার খরচ নিজেই বহন করতেন। তিনি মানতের টাকা নিতেন না। তার নামে আসা লাখ লাখ টাকা তিনি গরীব দুঃখিদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন।

(১১) দুর্নীতি উচ্ছেদ কমিটি

হুজুর (রহ.) তার আলোচনায় বলেন-"বাংলাদেশে প্রধান সমস্যা জনসংখ্যার বিস্ফোরণ বা অন্য কিছুই নয় বরং দুর্নীতি ও চরিত্রহীনতাই প্রধান সমস্যা। এ সমস্যার সমাধান ছাড়া কোন ক্রমেই শান্তি কায়েম হতে পারে না। দুর্নীতির মূল উৎপাটন করে সৎ ও আদর্শ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সকল শুভ উদ্যোগ ও উন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।"[৮৬] তাই একটি দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গড়ার লক্ষে তিনি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে ঝালকাঠির গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে তিনি গঠন করেন দুর্নীতি উচ্ছেদ কমিটি।[৮৭]

(১২) লিল্লাহ বোর্ডিং

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) দীনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করলেন তখন দেখলেন অনেক যুবক আছে যাদের দীন শিক্ষার আগ্রহ থাকলেও থাকা খাওয়ার অভাবে দীন শিখতে পারছে না। তাই এ সমস্ত যুবকদের জন্য তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন লিল্লাহ বোর্ডিং। যেখানে বর্তমানে প্রায় ৩০০০ ছাত্র ছাত্রী ফ্রি খেয়ে লেখাপড়া করছে।[৮৮]

---

৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৮৬ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

৮৭ গবেষক ০২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দুর্নীতি উচ্ছেদ কমিটি-এর সদস্য ডা: মো: মোসাদ্দেক হোসেনের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৮৮ গবেষক ০৪-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে লিল্লাহ বোর্ডিং-এর পরিচালক মো: আ: সোবাহানের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

(১৩) মফিজিয়া এতিমখানা

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ:) এতিম ছাত্রদের কথা চিন্তা করে নিজ পিতার নামে নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন নেছারাবাদ মফিজিয়া ইয়াতিমখানা। যেখানে প্রায় ২০০ ইয়াতিমের ভরণ পোষণ দেয়া হয়।[৮৯]

(১৪) খানকায়ে নেছারিয়া

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) দীন প্রচারের জন্য দেশের আনাচে কানাচে অনেক খানকা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে তার নিজ বাড়িতে তার পীর সাহেবের নামে প্রতিষ্ঠা করেন খানকায়ে নেছারিয়া। যেখান থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে দীনি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।[৯০]

(১৫) বার্ষিক মাহফিল

বর্তমানে দীন শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হল মাহফিল। এ কথা উপলব্ধি করে তিনি নিজে প্রায় সারা বছরই বিভিন্ন স্থানে মাহফিল করতেন এবং মানুষদেরকে দীনের দাওয়াত দিতেন। আর তার নিজ বাড়িতে প্রতি বছর ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি নির্দিষ্ট তারিখে মাহফিল প্রতিষ্ঠা করেন। যেখানে সারা দেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ অংশগ্রহণ করে দীনি শিক্ষা লাভ করেন।[৯১]

(১৬) জামে মসজিদ

দীনি শিক্ষার মূল কেন্দ্রই হল মসজিদ। এ কথা উপলব্ধি করে তিনি দেশে শত শত মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই মসজিদগুলোতে মসজিদ ভিত্তিক বিভিন্ন শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে। তিনি তার নিজ বাড়িতে সর্বপ্রথম ১৯৪৫ সালে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটি নেছারাবাদ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ নামে পরিচিত এবং এটি এখন পাঁচতলা বিশিষ্ট । এখানে প্রায় একই সাথে ৫ হাজার মানুষ নামাজ আদায় করতে পারেন।[৯২]

(১৭) আজিজিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ:) পবিত্র কুরআন মানুষ যেন ভালো করে মুখস্ত করতে পারে এ জন্য অসংখ্য হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে অন্যতম হল তার নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী নেছারাবাদ আজিজিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা। ১৯৭৮ সালে এটি প্রতিষ্ঠা

---

৮৯ গবেষক ০২-০৬-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ইয়াতিমখানা-এর পরিচালক মো: নূরে আলমের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯০ গবেষক ০৫-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে খানকায়ে নেছারিয়া -এর পরিচালক মো: আ: আলিমের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯১ গবেষক ২২-০২-২০১৯ খ্রি. তারিখ স্বশরীরে মাহফিলে উপস্থিত হয়ে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯২ গবেষক ২২-০৮-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) এর বড়ো মেয়ের ছোটো ছেলে মো: ফয়জুল হক-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

করেন। এখানে প্রায় ৪০০ ছাত্র পড়াশুনা করে। এখান থেকে প্রতি বছর প্রায় ২০-২৫ জন ছাত্র হাফেজ হয়ে কুরআনের খেদমতে বের হয়ে যায়।[৯৩]

(১৮) আজিজিয়া নূরাণী তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা

তিনি ছোটো ছোটো বাচ্চাদের সহীহ শুদ্ধরূপে দীন ইসলাম প্রাকটিক্যাল বুঝার জন্য অনেকগুলো তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে অন্যতম হল নেছারাবাদ আজিজিয়া নূরানী তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা। ১৯৯৪ সালে এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এখান থেকে প্রতিবছর শত শত শিশু দীন ইসলামের প্রাকটিক্যাল শিক্ষা নিয়ে বের হয়।[৯৪]

(১৯) ফোরকানিয়া মাদ্রাসা

তিনি সাধারণ মানুষদের জন্য কুরআন তেলাওয়াত শেখানোর জন্য নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন ফোরকানিয়া মাদ্রাসা। যেখানে প্রতিদিন সকালে অনেক মানুষ কুরআন শিখতে আসে এবং সহীহ শুদ্ধরূপে কুরআন শিখতে পারে।

(২০) মেহমান খানা

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ প্রতিদিন হযরত কায়েদ সাহেব হুজুরের নিকট আসত। কেউ আসত দীন শিখতে আবার কেউ কেউ আসত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে। তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন মেহমান খানা। বর্তমানে মেহমান খানার জন্য ৫তলা বিশিষ্ট ভবন রয়েছে। যেখানে প্রতিদিন শত শত মানুষের মেহমানদারী করানো হয়।[৯৫]

নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স এর আরো কতিপয় প্রতিষ্ঠান-

(২১) উম্মুল খায়ের বালিকা নূরাণী কিন্ডার গার্টেন

(২২) তালিমে এলমে দীন কোর্স

(২৩) নেছারাবাদ বাণিজ্য ও শিল্প সংস্থা-(নেবাশিস)

(২৪) হিযবুল্লাহ দারুল মুতালায়া

(২৫) পাত্র-পাত্রি সংযোগ সংস্থা

(২৬) হিযবুল্লাহ লাইব্রেরি

(২৭) শারেকায়ে হিযবুল্লাহ

(২৮) মুছলিহীন শিল্পী গোষ্ঠী

---

৯৩ গবেষক ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) এর মেজ মেয়ের ছোটো ছেলে মো: কামরুজ্জামান-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯৪ গবেষক ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদ কমপ্লেক্স-এর কর্মকর্তা মো: সোলায়মানের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯৫ গবেষক ১৯-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদ কমপ্লেক্স-এর কর্মকর্তা মো: মাহবুবের কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

(২৯) কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক সংস্থা
(৩০) কৃষি খামার
(৩১) মৎস খামার
(৩২) পোল্ট্রি খামার
(৩৩) ছাত্র হিযবুল্লাহ পাঠাগার
(৩৪) ঔষধি গাছ-গাছড়ার বাগান
(৩৫) সাপ্তাহিক তাদরিবী জলসা
(৩৬) ফোরকানিয়া বালিকা মাদ্রাসা
(৩৭) নেছারাবাদ মিডিয়া সেন্টার
(৩৮) কমপ্লেক্স ভবন
(৩৯) নৈশ বিদ্যালয়
(৪০) নাহু ছরফ কোর্স (রমজান)
(৪১) মাসিক তালিমি জলসা
(৪২) সাপ্তাহিক তাদরীবি জলসা

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদী (রহ.) প্রতিষ্ঠিত দীনি প্রতিষ্ঠান

আলিয়া মাদ্রাসা

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় দীনি শিক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। যেগুলো থেকে প্রতিবছর হাজার হাজার আলেম বের হয়ে দীনি খেদমত আঞ্জাম দিচ্ছেন। নারী শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি মহিলা মাদ্‌রাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত এসব প্রতিষ্ঠান মাদ্‌রাসা শিক্ষার জগতে এক বৈপ্লবিক ধারার সূচনা করেছে। আলিয়া মাদ্‌রাসা ধারায় বাংলাদেশে রাসূলুল্লাহ (স)-এর পূর্ণাঙ্গ সুন্নাতে নববীর পাবন্দি এরকম মারকাজ খুব বেশী পাওয়া যায় না। মাওলানা নেছারাবাদী (র)-এর প্রতিষ্ঠিত উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:

১। ঝালকাঠি এন এস কামিল মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

২। নেছারাবাদ জিনাতুন্নেছা মহিলা ফাজিল মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

৩। জিরাইল আযীযিয়া ফাজিল মাদ্রাসা

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে জিরাইল আযীযিয়া ফাজিল মাদ্রাসা অন্যতম। এটি বাকেরগঞ্জ থানায় জিরাইল গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৭৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এর অন্যতম জমি দাতারা ছিলেন জনাব আ: আজিজ হাওলাদার, জয়নাল মুন্সী, আ: কাদের হাওলাদার, প্রথম থেকেই এটি পরিচালনা করেন তার মেজ জামাতা আলহাজ মাও. আ: সাদেক, অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মাও. মো: ইব্রাহীম, বর্তমান অধ্যক্ষ মাওলানা ইয়াকুব শরীফ।[৯৬]

৪। কুতুবনগর আযীযিয়া আলিম মাদ্রাসা

ঝালকাঠি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত কুতুবনগর আযীযীয়া আলিম মাদ্রাসা। এটি ১৯৬৫ সনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে পরিচালক ছিলেন মুন্সী ফজলুর রহমান, এ প্রতিষ্ঠানে জমি দাতাদের মধ্যে অন্যতম আশরাফ আলী তালুকদার, কলমদার খান, নুরুল

৯৬ গবেষক ১০-০৫-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) এর মেজ মেয়ের মেজ ছেলে মো: শফীকুর রহমান-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

ইসলাম তালুকদার। প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন মাও. সৈয়দ মোহাম্মদ, বর্তমান অধ্যক্ষ হিসেবে আছেন মাও. আ: মান্নান।[৯৭]

৫। জয়েশী আযীযিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

মাদ্রাসাটি নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় ১৯৮১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় । প্রতিষ্ঠাকালীন থেকে এর পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন মাও. কারামত আলী নিজামী। বর্তমান সুপার মাওলানা হাবিবুর রহমান।[৯৮]

৬। পশ্চিম চাড়াখালী আযীযিয়া দাখিল মাদ্রাসা, রাজাপুর, ঝালকাঠি।

নেছারাবাদী (রহ:) মাদ্রাসাটি ১৯৮৩ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এটি তার বড়ো জামাতা মাও. মো: মোজাম্মেল হক রাজাপুরী পরিচালনা করে আসছেন। জমি দাতাদের মধ্যে অন্যতম হল এ্যাডভোকেট হোসেন আলী পনু মোল্লা। প্রথম সুপার ছিল মাওলানা খলীলুর রহমান। বর্তমান সুপার মাও. ছাইফুল হক।[৯৯]

নূরাণী ও হাফেজি মাদ্রাসা

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর(রহ.) আলিয়া মাদ্রাসার পাশাপাশি কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধরূপে শিক্ষা দেয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে হাফেজি ও নূরাণী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

১। নেছারাবাদ আযীযিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল হাফেজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে নেছারাবাদ আযীযিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা অন্যতম। এটি তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৭৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

২। আযীযিয়া নূরাণী তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে আযীযিয়া নূরাণী তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা মাদ্রাসা অন্যতম।

এটি তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

---

৯৭ গবেষক ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কুতুবনগর আযীযীয়া আলিম মাদ্রাসার বর্তমান অধ্যক্ষ মাও. আ: মান্নান-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯৮ গবেষক ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জয়েশী আযীযিয়া দাখিল মাদ্রাসার বর্তমান সুপার মাওলানা হাবিবুর রহমান-এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৯৯ গবেষক ১০-০৭-২০১৯ খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে পশ্চিম চাড়াখালী আযীযিয়া দাখিল মাদ্রাসার বর্তমান সুপার মাও. ছাইফুল হক- এর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

৩। নেছারাবাদ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত নেছারাবাদ ফোরকানিয়া মাদ্রাসা । এটি ১৯৬৫ সনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৪। উম্মুল খায়ের বালিকা নূরাণী কিন্ডার গার্টেন, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি শহরের পাশে অবস্থিত উম্মুল খায়ের বালিকা নূরাণী কিন্ডার গার্টেন মাদ্রাসা । এটি ১৯৯৯ সনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৫। পিপলিতা আযীযীয়া নূরাণী মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে পিপলিতা আযীযীয়া নূরাণী মাদ্রাসা অন্যতম। এটি তাঁর নিজ গ্রামের পাশের গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

৬। রূপাতলি আযীযীয়া নূরাণী মাদ্রাসা, বরিশাল

বরিশাল শহরের পাশে অবস্থিত রূপাতলি আযীযীয়া নূরাণী মাদ্রাসা । এটি ২০০০ সনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

৭। কিফাইত নগর আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল তালিমুল কুরআন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে কিফাইত নগর আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা অন্যতম। এটি তাঁর নিজ গ্রামের পাশের গ্রাম কিফাইত নগরে অবস্থিত। এটি ২০০৪ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

৮। পরমহল আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

ঝালকাঠি শহরের পাশে অবস্থিত পরমহল আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা । এটি ১৯৯৮ সনে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৯। ঢেপুয়ার পাড় আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

ঢেপুয়ার পাড় আযীযিয়া নূরাণী মাদ্রাসা নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রতিষ্ঠিত একটি নূরাণী মাদ্রাসা। ঝালকাঠি শহরের পাশে অবস্থিত এই মাদ্রাসাটি ১৯৯৭ সনে প্রতিষ্ঠা করেন ।

১০। রহমানিয়া আযীযিয়া ইয়াতিমখানা, ঝালকাঠি

নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় যে সকল ইয়াতিমখানা প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে রহমানিয়া আযীযিয়া ইয়াতিমখানা অন্যতম। এটি তাঁর নিজ গ্রামের পাশের গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।এখানে প্রায় ৫০ জন ইয়াতিম লেখাপড়া করছে।

১১। মফিজিয়া আযীযিয়া ইয়াতিমখানা, ঝালকাঠি

মফিজিয়া আযীযিয়া ইয়াতিমখানা নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত। এটি ১৯৯৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রায় ৫০ জন ইয়াতিম লেখাপড়া করছে।

১২। গরীবে নেওয়াজ আযীযিয়া ইয়াতিমখানা, ঝালকাঠি

মফিজিয়া আযীযিয়া ইয়াতিমখানা নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি তাঁর নিজ গ্রামে অবস্থিত। এটি ২০০৫ সনে প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে প্রায় ৩০ জন ইয়াতিম লেখাপড়া করছে।

১৩। লেশপ্রতাপ আযীযিয়া কারিমিয়া ক্যাডেট মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

লেশপ্রতাপ আযীযিয়া কারিমিয়া ক্যাডেট মাদ্রাসা নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় । ঝালকাঠি শহরের পাশে অবস্থিত । এটি ২০০২ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

১৪। দর্জিবাড়ি আযীযিয়া ছালামিয়া মাদ্রাসা, ঝালকাঠি

দর্জিবাড়ি আযীযিয়া ছালামিয়া মাদ্রাসা নেছারাবাদী (রহ)-এর প্রচেস্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় । এটি ঝালকাঠি শহরের পাশে অবস্থিত। এটি ১৯৯০ সনে প্রতিষ্ঠা করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদী (রহ.) কতৃক প্রতিষ্ঠিত সংগঠন

মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন ইসলামী জিন্দেগী যাপন করতে হলে ইসলাহে কওম (সমাজ শুদ্ধি) ইসলাহে হুকুমত (রাষ্ট্র শুদ্ধি) প্রয়োজন। আর এজন্য সাংগঠনিক জীবন অপরিহার্য। এজন্যই তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠতি কয়েকটি সংগঠনের ইতিহাস নিম্নে পেশ করা হল:

১. বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীন:

ছারছীনা দরবার থেকে নেছারাবাদ চলে আসার পর তিনি স্বাধীনভাবে তার চিন্তা-চেতনা, দর্শন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য একটি সংগঠন করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এ লক্ষে ১৯৯৭ ইং সনে ৩রা জানুয়ারি হুজুর হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীন নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।[১০০] হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীন সম্পর্কে তিনি বলেন- "ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাামী আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষে দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরে তৎপরতা জারী রয়েছে। ব্যক্তিগত ও দলগত পর্যায়ের এসব খেদমতের অপরিসীম মূল্য রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে এও সত্য যে এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা দ্বারা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে না। কাঙ্ক্ষিত লক্ষে আমরা পৌঁছতে পারছি না। এ লক্ষে হাসিলের জন্য সকল বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাকে এক লক্ষাভিসারী করা আবশ্যক। একটি সম্মিলিত সোপান ধারা সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য দেশের বিভিন্ন দীনি সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। প্রয়োজন প্রত্যেকের খেদমতের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন। পারস্পরিক যোগাযোগ ও স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই ক্রমান্বয়ে একটি মিলিত ধারা সৃষ্টি হতে পারে। এ লক্ষ সামনে রেখেই আমরা গঠন করেছি বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীন নামে একটি দীনি সংগঠন। এ সংগঠন দলীয় রাজনীতির সাথে সম্পর্কহীন। এ সংগঠনের মধ্যেই আমরা সকল ওলামা মাশায়েখ, ইসলামপন্থী ও দেশ প্রেমিক নেতৃবৃন্দকে 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ' নীতির আলোকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে দীনের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার জন্য দাওয়াত দিয়ে আসছি। আমাদের কর্মসূচিও এমনভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে, যাতে সকল শ্রেণির

১০০ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

মুসলমান ও সংগঠনের মাধ্যমে নিজ নিজ স্বকীয়তা বজায় রেখে দীনের খেদমত আঞ্জাম দিতে পারেন।"[১০১]

জমিয়াতুল মুছলিহীনের লক্ষ ও উদ্দেশ্য

* **লক্ষ:** মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন

* **উদ্দেশ্য:** জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়তের আদর্শ ও বিধান কার্যকরী করা।

* **কর্মসূচি:**

তিনদফা কর্মসূচি-

(১) ইসলাহে নফস (আত্মশুদ্ধি)

(২) ইসলাহে কওম (সমাজশুদ্ধি)

(৩) ইসলাহে হুকুমত (রাষ্ট্রশুদ্ধি)

২. সর্বদলীয় আদর্শ সমাজ বাস্তবায়ন পরিষদ:

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন একজন সমাজ সচেতন মানুষ। তিনি সমাজ ও দেশ নিয়ে ভাবতেন। একটা সুন্দর সমাজ কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এ নিয়ে তার পরিকল্পনা ছিল অনেক। তিনি বলেন- "আমরা দুর্নীতি-দুষ্কৃতি ও অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনই করি না কেন নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয় রোধের জন্য যে ব্যবস্থাই নিয়ে থাকি না কেন এজন্য সর্বাধিক ও সর্বপ্রথম দরকার সৃষ্টিকর্তা ভিত্তিক সকল শ্রেণির আস্তিকের ঐক্য। ধর্ম, বর্ণ ও দলমত নির্বিশেষে সকলেই আমাকে পছন্দ করেন। আমিও একইভাবে তাদের পছন্দ করি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে আমি মনে করি এমন কতগুলো ইস্যু থাকা দরকার যে ইস্যুগুলোর ভিত্তিতে সব ধর্মের, সব দলের ও সব মতের লোকজন একত্রিত হতে পারে এবং দেশ ও জাতিকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।"[১০২] তিনি বলেন-"দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির অভিশাপে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগতেছে আজ সারা বিশ্বের মানুষ। শান্তি বিদায় নিয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন হতে এই দুর্নীতি ও দুষ্কৃতির প্লাবনে। এজাতীয় সমস্যা মোকাবেলা করতে প্রয়োজন সকল ধর্মের অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। প্রয়োজন সব ধর্ম ও মতের অনুসারীদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। গোটা মানবজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্য মুসলিম, হিন্দু, খৃস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মানুসারী দেশ প্রেমিক ভাইদের আমি সম্মিলিত ভাবে নাস্তিক তথা

---

১০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০

১০২ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠপ-৫০

ধর্মহীনতার প্রতিরোধে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি।"[১০৩] হুজুর এ লক্ষেই ১৯৯০ ইং সনে প্রতিষ্ঠা করেন সর্বদলীয় আদর্শ সমাজ বাস্তবায়ন পরিষদ। হুজুর কেবলার এই আদর্শ সমাজ গড়ার আহ্বানে দলমত নির্বিশেষে সকল দেশ প্রেমিকগণ আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছিল। এ সংগঠনের ব্যানারে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে হুজুর কেবলার নেতৃত্বে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।[১০৪]

এছাড়াও তিনি আরও কিছু শাখা সংগঠন গঠন করেছিলেন

১. তোলাবায়ে মুছলিহীন ও ছাত্র মুছলিহীন :

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) সব সময়ই মনে করতেন মাদ্রাসার ছাত্র ও স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে আলাদা কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। একজন মাদ্রাসার ছাত্রের কাছে আমল করা যত সহজ কিন্তু একজন স্কুলের ছাত্রের কাছে আমল করা তত সহজ না। তাই তাদের মধ্যে দীন প্রচার করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হবে। সে লক্ষে তিনি মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন তোলাবায়ে মুছলিহীন আর স্কুলের ছাত্রদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন ছাত্র মুছলিহীন। এ দুটি সংগঠনের মাধ্যমে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার ছাত্রদেরকে সত্যিকারে নায়েবে নবী তৈরী করার জন্য তিনি নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন।

২. যুব মুছলিহীন:

যুবকদেরকে তাদের আত্মার খোরাক শরীয়ত সম্মতভাবে মিটানোর জন্য আলাদা পরিকল্পনা দরকার ভেবেই হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) প্রতিষ্ঠা করেন যুব মুছলিহীন নামক সংগঠন। এই সংগঠনের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) সকল শ্রেণির যুবকদের দীনের ছায়াতলে আনার চেষ্টা করেছেন।

৩. হিযবুল্লাহ আল হেলাল পার্টি (কিশোর সংগঠন):

শিশু কিশোররা যেন বিপথগামী না হয়ে যায় এ জন্য নেছারাবাদী (রহ.) শিশু কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন হিযবুল্লাহ আল হেলাল পার্টি। এ সংগঠনের মাধ্যমে শিশু কিশোররা তাদের বসত অনুসারে সাংগঠনিক জীবন যাপন করতে পারে।

---

১০৩ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

১০৪ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৪. হিযবুল্লাহ শ্রমিক সমিতিঃ

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) সাধারণ জনগণের মধ্যে সাংগঠনিক ভাবে দীন শিক্ষা দিতে যে কয়টি সংগঠন করেছেন তার মধ্যে হিযবুল্লাহ শ্রমিক সমিতি অন্যতম। তিনি শ্রমিকদের দুঃখ বেদনার শরীয়ত সম্মত উপায়ে সমাধান করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেন হিযবুল্লাহ শ্রমিক সমিতি।

৫. আঞ্চলিক জমিয়তে হিযবুল্লাহ

৬. হিযবুল্লাহ সংগ্রাম পরিষদ

৭. হিযবুল্লাহ ইমাম সমিতি

৮. আঞ্জুমানে ইত্তেহাদুল মুসলিমীন

৯. নেছারাবাদ আঞ্চলিক সমাজ কল্যাণ সংস্থা

১০. কামিনী রায় স্মৃতি সংসদ

তৃতীয় অধ্যায়
মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদীর রচনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ
শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক রচনাবলি

মাওলানা নেছারাবাদী বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আলিম, সুবক্তা, লেখক ও সাহিত্যিক ছিলেন। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর স্বভাবজাত রুচি ছিল। ইসলাম বিস্তারে মৌলিক গ্রন্থ রচনায় তিনি ঐতিহাসিক অবদান রেখে গেছেন। আরবী, উর্দু ও ফারসিসহ বিভিন্ন ভাষার পাশাপাশি মাওলানা নেছারাবাদী বাংলা ভাষায়ও দক্ষ ছিলেন। তৎকালীন পরিবেশে মাওলানা নেছারাবাদী বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইসলাম প্রচারের জন্য মাতৃভাষার বিকল্প নেই। তাই তিনি মাতৃভাষায় গ্রন্থ রচনায় মনোযোগী হন। মাওলানা নেছারাবাদীর রচনাসম্ভারকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. শিক্ষা ও সমাজ কল্যাণমূলক

২. আকায়েদ ও দর্শনমূলক

৩. সমালোচনা ও জীবনীমূলক

৪. ভাষণ সংকলন

মাওলানা নেছারবাদী বিভিন্ন বিষয়ে ছোট-বড়, মাঝারি মিলে প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মাঝে অনেকগুলোর পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না। নিম্নে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্যেখযোগ্য ২৩টি সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো।

১. হেদায়াতে কুরআন

এ গ্রন্থটি হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৬৮ খ্রি. ১ম প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৭০ সালে ২য় সংস্করণ এবং ২০১৫ খ্রি. সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এর পৃষ্ঠা ২০০। এ কিতাব রচনা প্রসঙ্গে কায়েদ সাহেব হুজুর কিতাবের ভূমিকায় বলেন- "ছারছীনার মরহুম হযরত পীর সাহেব কিবলা একবার কথা প্রসঙ্গে এরশাদ ফরমায়েছিলেন,'কুরআন মাজীদের হেদায়াত সমূহ সংগ্রহ করে বাংলা ভাষায়; পুস্তিকাকারে সমাজে প্রকাশ করা হলে লোকের খুব ফায়দা হত।' হুজুর কেবলা কথা কয়টি আমাকে লক্ষ করে বলেছিলেন কিনা তা স্মরণ নাই। তবে একথা সত্য যে, হুজুরের এরশাদ আমার অন্তরে এক অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার একান্ত আগ্রহ থাকা স্বত্ত্বেও নানা ওজরে হুজুর কেবলার জীবিতাবস্থায় এ উদ্দেশ্যে

বিশেষ কোনো কাজ করতে সমর্থ হইনি। হুজুরের ইন্তিকালের কয়েকবছর পরে ছারছীনা থেকে প্রকাশিত 'পাক্ষিক তাবলীগ' পত্রিকায় ধারাবাহিক রূপে 'হেদায়াতে কুরআন' প্রকাশ করতে আরম্ভ করি। সেটাই একত্রিত করে 'হেদায়াতে কুরআন' প্রথম খণ্ড প্রকাশ করা হলো।"[১০৫]

কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও আলোচ্য বিষয়

*** আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চারণে বিশেষত্ব**

গ্রন্থকার তার লিখনিতে উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালার নাম লিখেছেন। যেখানেই তিনি আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চরণ করেছেন সেখানেই তিনি আরো বিশেষণ জুড়ে দিয়েছেন। অত্র কিতাবে যেখানেই তিনি আল্লাহ তায়ালার নাম উচ্চরণ করেছেন সেখানেই তিনি তার সিফাত ব্যবহার করেছেন। অসংখ্য যায়গায় তিনি আল্লাহর নাম ব্যবহার করেছেন।

*** আল কুরআনের পরিচয়**

লেখক অত্র কিতাবের শুরুতে পবিত্র কুরআনে কারীম[১০৬] পৃথিবীতে কোন অবস্থায় পাঠানো হয়েছে এবং সেই সময়ে সামাজিক অবস্থা কি রূপ ছিল এর একটি বর্ণনা দিয়েছেন।

---

১০৫ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, হেদায়াতে কুরআন (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ০৩

১০৬ কুরআন মজিদ ইসলাম ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, যা আল্লাহর বাণী, সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। আরবী ব্যাকরণে 'কুরআন' শব্দটি একটি 'মাসদার' যা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সূরা আল-কিয়ামাহার ১৭-১৮আয়াতে এটি, (قرأ) ক্বরা'আ (পাঠ করা বা আবৃত্তি করা) ক্রিয়ার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন শব্দের অর্থ পাঠ করা, যা পাঠ করা হয়। আর পরিভাষায়-আল্লাহ তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব জাতির হেদায়াত হিসাবে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর উপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তার নাম আল কুরআন।

" كلامُ اللهِ تعالى المنزَّل على نبيه مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، المُعْجِز بلفْظه ومعناه، المتعبَّدُ بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من أَوَّلِ سورة الفاتحة إلى آخِرِ سورة الناس"

এই কিতাব আল্লাহর ফেরেশতা জিবরাইল এর মাধ্যমে ইসলামের শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মৌখিকভাবে ভাষণ আকারে কুরআনের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন, দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে সম্পূর্ণ কুরআন অবতীর্ণ হয়। কুরআনের প্রথম আয়াত অবতীর্ণ হয় ৬০৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর যখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স ৪০ বছর। এবং অবতরণ শেষ হয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের বছর অর্থাৎ ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। কুরআন হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অলৌকিক ঘটনা যা তার নবুয়তের প্রমাণ স্বরূপ । এবং ঐশ্বরিক বার্তা প্রেরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায় যা আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু হয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল কর্মকাণ্ড উম্মতের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যই কুরআন অবতীর্ণ করা হয়। কুরআনের আয়াতসমূহে কুরআন শব্দটি ৭০ বার এসেছে।

ইসলামী ইতিহাস অনুসারে দীর্ঘ তেইশ বছর ধরে খণ্ড খণ্ড অংশে এটি ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়। ইসলামের অনুসারীরা কুরআনকে একটি পুর্ণাঙ্গ জীবন বিধান বলে বিশ্বাস করে। কুরআনে সর্বমোট ১১৪টি সূরা আছে। আয়াত বা পঙ্‌ক্তি সংখ্যা ৬,৬৬৬ টি; মতান্তরে ৬,২৩৬

*** আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব**

লেখক অত্র কিতাবে পবিত্র কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব কী এবং এর প্রভাবে সমাজে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা বর্ণনা করেছেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন একটা অপবিত্র জাতিকে পবিত্র করেছে। সমাজের চোখে নিচু মানুষকে সম্মানের উচ্চ শিখরে বসিয়েছে, দাসগণকে রাজার আসনে বসিয়েছে। শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে পরিণত করেছে। যেখানেই পবিত্র কুরআনের দাওয়াত চলেছে সেখানেই হাজার হাজার পাপী তাপী আল্লাহ তায়ালার খাস বান্দায় পরিণত হয়েছে।

***আল কুরআনের বিষয়বস্তু**

সমগ্র সৃষ্টিকুল বিশেষত মানব ও জীন জাতি কুরআনের আলোচ্য বিষয়।[১০৭] মানুষের নিজ রচিত পথ সমূহের বিলোপ সাধন করে আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহ্বানই কুরআনে হাকীমের মূল বিষয়বস্তু। দীর্ঘ তেইশ বছরকাল সময়ে এটি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে শব্দে আল্লাহ তায়ালা তার বন্ধুকে শুনিয়েছেন অবিকল সেই শব্দেই এটা দুনিয়ার বুকে প্রচলিত আছে।

*** আল কুরআনের সংগ্রহ**

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট অল্প অল্প করে পবিত্র কুরআনের আয়াত নাযিল হয়। আর তিনি ছিলেন নিরক্ষর এবং যাদের সম্বোধন করে এই কুরআন নাযিল হত তারাও অধিকাংশ ছিল নিরক্ষর। তাই যখন যে আয়াত নাযিল হত তিনি তা মুখস্ত করতেন এবং সাহাবা কেরামদের তা মুখস্ত করার আদেশ করতেন ও লিখে রাখতে বলতেন। তারা কাগজের টুকরা খেজুর পাতা, কাষ্ঠ ফলক, পাথর খণ্ড, চামড়ার গিলাফ ও কাপড়ের থলে প্রভৃতির উপর লিখে রাখতেন। মহানবী (স.) অনেক সাহাবীকে কাতেবে ওহী[১০৮] হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন।[১০৯]

টি। কুরআন ধারাবাহিকভাবে অবতীর্ণ ধর্মীয় গ্রন্থগুলোর মধ্যে সর্বশেষ। (মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, হেদায়াতে কুরআন, (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ১০)

১০৭ হেদায়াতে কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১০৮ আরবীতে ওহী (وحى) শব্দটি বাবে ضرب এর মাসদার। এটির আভিধানিক অর্থ হলো: গোপনে জানিয়ে দেয়া, ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা-ইত্যাদি। এ শব্দটি ইলকা বা মনের মধ্যে কোনো কথা নিক্ষেপ করা ও ইলহাম বা গোপনে শিক্ষা ও উপদেশ দান করার অর্থে ব্যবহৃত হয় । ব্যবহারিক ভাবে ওহী দ্বারা ইসলামে আল্লাহ কর্তৃক রাসুলদের প্রতি প্রেরিত বার্তা বোঝানো হয়।

পরিভাষায়, إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير واسطة

নবী-রাসুলদের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে ওহী বলে। কিংবা, গোপনে আল্লাহ প্রদত্ত নবী-রাসুলদেরকে কোনোকিছু জানানোর নামই ওহী।

*তারতীবে কুরআন

বর্তমানে পবিত্র কুরআন যে আকারে পবিত্র মাসহাফে লিখিত আছে অবিকল সে রূপে কুরআন শরীফ লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ রয়েছে। যখন অধিকাংশ কুরআন অবতীর্ণ হলো তখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে হযরত জিব্রাইল (আ:) এর ইংগিতে মহানবী (স.) সে তারতীবেই কুরআন শরীফ লিখেছিলেন যে তারতীবে লাওহে মাহফুজে[১১০] রক্ষিত আছে।[১১১]

ওহী দু প্রকার।

১.وحى متلو বা পঠিত ওহী। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে প্রাপ্ত, ইহা কিতাবুল্লাহ বা পবিত্র কুরআন শরীফ, যার ভাব ও ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহ তালার। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ তালার ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

২.وحى غير متلو বা অপঠিত ওহী। পরোক্ষ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান। এরই নাম সুন্নাহ বা হাদিস। এর ভাব মহান আল্লাহর, কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ভাষায়, নিজের ভাব-ভঙ্গি, কাজ, কথা, আচার-ব্যাবহার ও আদেশ-নিষেধ এবং সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট যখন কোনো ওহি আসত তখন একদল সাহাবি ওহিগুলো বিভিন্ন জিনিসের উপর লিখে রাখতেন, এদেরকে কাতিবে ওহি বলা হত। তথ্যানুসন্ধানে পাওয়া যায়, প্রায় ৪২ জন সাহাবি ওহী লিখেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট হজরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম কুরআনের যে অংশ যখন নিয়ে আসতেন, তা কোন সূরার কোন স্থানে সংযোগ করতে হবে তা তিনি বলে দিতেন। আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন ওহী লেখক সাহাবিদের ডেকে অবতীর্ণ অংশকে সংশ্লিষ্ট সূরার নির্ধারিত স্থানে সংযোগ করার নির্দেশ দিতেন।

কাতিবে ওহিদের অন্যতম হলেন-

*হজরত যায়িদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু,
* হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু,
* হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু,
* হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*উবাই ইবন কাদব রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত যুবাইর ইবনুল আওয়াম রাদিয়াল্লাহু আনহু,
* হজরত মুদআবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু,
* হজরত আব্বাস ইবনু সাদঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু,
*হজরত মুগীরা ইবন শু'বা রাদিয়াল্লাহু আনহু, ও
* হজরত হানযালা রাদিয়াল্লাহু আনহু [এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

যখন আল-কুরআন নাজিল হয়, তখনকার যুগে লেখার উপকরণ ছিল খুবই দুর্লভ। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় সাহাবিগণ নাজিলকৃত কুরআনের আয়াত খেজুরের ডাল, প্রস্তর খণ্ড, চামড়া-উটের চামড়া, হাড়, কাপড়ের টুকরা, গাছের পাতা, বাকল, বাঁশের টুকরা, পশুর হাড়, পাথর-শিলা প্রভৃতি বস্তুর উপর লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেন।

১০৯ হেদায়াতে কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১১০ লাওহে মাহফুজ আরবি শব্দ। লাওহ অর্থ ফলক। মাহফুজ অর্থ সংরক্ষিত। লাওহে মাহফুজ অর্থ সংরক্ষিত ফলক। পরিভাষায়- ابن كثير رحمه الله বলেন ,

هو في الملإ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل

*** আল কুরআনে বর্ণিত বিষয়**

পৃথিবীতে এমন কিছু নাই যা কুরআনে পাকে বলা হয়নি। কুরআন পাকে যা বর্ণিত হয়েছে বিশ্ববাসীর সব চাহিদা পূরণের জন্য তাই যথেষ্ট। কেউ কেউ এটাকে পাঁচটি ইলমে ভাগ করেছেন।

(ক) ইলমে আহকাম বা করণীয় বা বর্জনীয় বিদ্যা[১১২]

(খ) ইলমে মোখাসামা বা তর্কবিদ্যা [১১৩]

(গ) ইলমে তাযকীর বে আলাইল্লাহ[১১৪]

(ঘ) ইলমে তাযকীর বে আইয়ামিল্লাহ[১১৫]

(ঙ) ইলমে তাযকীরে মওত।[১১৬]

ইসলামী পরিভাষায় লাওহে মাহফুজ বলা হয় ঊর্ধ্ব আকাশে সংরক্ষিত ফলক, যার মধ্যে সৃষ্টির শুরু লগ্ন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সব কিছু আল্লাহ তায়ালা লিখে রেখেছেন।

আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে একাধিক স্থানে লাওহে মাহফুজের কথা উল্লেখ করেছেন। এক জায়গায় পরিষ্কার শব্দ এবং অন্যান্য জায়গায় রূপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ বলেন বরং এটা মহান কুরআন। লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ।' (সূরা বুরুজ: ২১–২২)। অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন, তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তায়ালা জানেন যা কিছু আকাশে ও ভূমণ্ডলে আছে। এসব কিতাবে লিখিত আছে। এটা আল্লাহর কাছে সহজ।' (সূরা হজ: ৭০)।

তাফসিরে তাবারিতে বলা হয়েছে, এখানে কিতাব বলে লাওহে মাহফুজ উদ্দেশ্য। তা ছাড়া সূরা ইয়াসিনে ১২ নম্বর আয়াতে ইমামুম মুবীন শব্দে এবং সূরা হাদিদের ২২ নম্বর আয়াতে কিতাব শব্দে লাওহে মাহফুজের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

লাওহে মাহফুজ অপরিবর্তনীয়, মানুষের ভাগ্যলিপিসহ মহাবিশ্বে কেয়ামত পর্যন্ত যা যা ঘটবে আল্লাহ তায়ালা সব কিছু লাওহে মাহফুজে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে রেখেছেন। সেই লেখার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ও হেরফের হওয়া সম্ভব নয়। তাফসিরে তাবারিতে উল্লেখ রয়েছে, লাওহে মাহফুজকে আল্লাহ তায়ালা বৃদ্ধি ও হ্রাস থেকে সংরক্ষণ করেন। অর্থাৎ তাতে যা লিখিত হয়েছে তা কমেও না বাড়েও না। তাফসিরে ইবনে কাসিরে সূরা বুরুজের আয়াতের তাফসিরে উল্লেখ রয়েছে, লাওহে মাহফুজ হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্তন-বিচ্যুতি থেকে মুক্ত।

১১১ হেদায়াতে কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১১২ ইসমুল আহকাম: অর্থাৎ উপাসনা, কায়-কারবার, ঘর-সংসার, রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি যে কোনো ক্ষেত্রে ওয়াযিব (অবশ্য করণীয়) মনদুব (প্রশংসনীয়) মুবাহ (বৈধ), মাকরুহ (অপছন্দনীয়) এবং হারাম (অবশ্য পরিত্যাজ্য) বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান। এ জ্ঞান যারা সম্যক ও সবিস্তারে অর্জন করে, তাদের ফকীহ (আইনজ্ঞ) বলা হয়।

১১৩ ইলমুল মুখসামা: অর্থাৎ ইয়াহুদী, নাসারা, মুশরিক ও মুনাফিক এ চারটি পথভ্রষ্ট দলের সাথে বিতর্কে পারদর্শিতা লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান। এ জ্ঞানের বিশ্লেষণ দানের দায়িত্ব যাঁদের, তাঁরা হলেন মুতাকাল্লিমীন।

১১৪ ইলমুত তাযকীর বে-আলা-ইলাল্লাহ বা শ্রষ্ঠা তত্ত্ব জ্ঞান: অর্থাৎ আল্লাহর অবদান ও নিদর্শন সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রাপ্ত বান্দার অভিজ্ঞান, স্রষ্টার সর্বাবিধ গুণাবলির পরিচয় সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো রয়েছে।

১১৫ ইলমুত তাযকীর বে আইয়্যামিল্লাহ: অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে অনুগতদের পুরস্কার ও অবাধ্যদের শাস্তি সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

*** আল কুরআনের আয়াত, সূরা রুকু এবং মনযিল প্রভৃতির বর্ণনা**

পবিত্র কুরআনের আয়াত সমূহ আল্লাহ্‌র নির্ধারিত। এ সম্পর্কে কারও মতামতের সুযোগ নেই। হুজুর (স.) যে আয়াত যে ভাবে তেলাওয়াত করেছেন, তাতে সামান্য ব্যতিক্রম করা যাবে না। আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) এর বর্ণনা মতে- পবিত্র কুরআনে আয়াতের সংখ্যা ৬৬৬৬ আর শব্দ ৮৬৪৩০টি, অক্ষর ৩২২৬৭১টি। সর্বমোট ১১৪টি সূরার মধ্যে ৮৬টি মক্কী এবং অবশিষ্ট ২৮টি মাদানী।[১১৭] পবিত্র কুরআনের ত্রিশ পারার ভাগ করা সম্পর্কে মতভেদ পাওয়া যায়। প্রতি মাসের ত্রিশ দিনে ত্রিশ পারার মাধ্যমে খতম করা সহজ হবে বিধায় ওলামায়ে কিরাম পাক কিতাবকে ত্রিশ পারায় ভাগ করেছেন।

***কুরআন তিলাওয়াত, শ্রবণ ও শিক্ষা**

পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত বর্ণনাতীত। হযরত আবু জ্বর(রা.) বলেছেন, হযরত রাসুলে কারীম (স.) আমাকে নসীহত করেন তুমি অবশ্যই কুরআন তেলাওয়াত করবে, পৃথিবীতে এটা তোমার পক্ষে নূর এবং সঞ্চিত ঝান্ডা স্বরূপ হবে। কুরআন শ্রবণের ব্যাপারেও আল্লাহ ও তার রাসুল অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআন শিক্ষাদান ও শিক্ষা গ্রহণেরও অনেক ফযীলত কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কুরআন শরীফ তেলাওয়াতের আদব ৬ টি-

১) জীবনে অন্তত একবার কুরআন শরীফের যে কোন অংশ হতে হলেও কিছু পরিমাণ তিলাওয়াত করা।

২) তিলাওয়াতের সময় হদছে আসগর হতে এবং স্পর্শ করার সময় হদছে আকবর হতে পবিত্র থাকতে হবে।

৩) শুদ্ধরুপে তেলাওয়াত করা।

৪) একমাত্র তেলাওয়াতের নিয়তেই পাঠ করা।

৫) কমপক্ষে পূর্ণ একটি আয়াত পাঠ করা।

৬) একাগ্রতার সাথে কেবলামুখী হয়ে তেলাওয়াত করা।[১১৮]

---

১১৬ ইলমে তাযকীরে মওত বা পরকাল-জ্ঞান: অর্থাৎ মৃত্যু ও তার পরবর্তীকালের অবস্থা সম্পর্কিত জ্ঞান। এতে পুনরুত্থান, একত্রীকরণ, হিসাব-নিকাশ ও বেহেশত-দোযখ সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো এসে যায়।

১১৭ হেদায়াতে কুরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

২. দোজাহানের সম্বল

এ পুস্তকে ইসলামের সর্বপ্রথম ভিত্তি কলেমা হতে শুরু করে যাবতীয় বিধানাবলির একটি ফিরিস্তি, তা আদায়ে করণীয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পালনের মসনুন দোয়া সমূহ একত্রিত করিয়া হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এই পুস্তকটি রচনা করেন। এই পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১ম প্রকাশিত হয় ১৯৮২ খ্রি., সর্বশেষ মুদ্রিত হয় ২০১৯ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসে এর পৃষ্ঠা-৯৬। এই পুস্তকের মধ্যে একজন মানুষ তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় মাছনুন দোয়া দরুদের প্রয়োজনীয়তা মিটাতে পারবে। এ পুস্তক সম্পর্কে লেখক বলেন- "ইসলামী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর বর্ণনাই কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামী অনুশাসন প্রতিপালন ও দৈনন্দিন সকল কাজে এ বিধান পালন করিতে হয় এবং তা আয়ত্ব করাও কর্তব্য। তবে সর্বসাধারণের জন্য দৈনন্দিন ইবাদত ও বন্দেগী পালনের ক্ষেত্রে করণীয় কার্যাবলি কুরআন ও হাদিস খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয় না। আবার অনেক সময় এ সকল কিছু আয়ত্বে রাখাও কঠিন হইয়া পরে। এ সমস্যার কথা ভাবিয়া ইসলামের সর্ব প্রথম ভিত্তি কালিমা থেকে শুরু করে যাবতীয় বিধানাবলির একটি ফিরিস্তি, তা আদায়ে করণীয় এবং নিত্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি পালনের মাসনুন দোয়া সমূহ একত্রিত করিয়া আমি দোজাহানের সম্বল নামে অত্র পুস্তকটি রচনা করি।"[১১৯]

কিতাবের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু

***বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

নেছারাবাদী (রহ:) তার এই কিতাবে অসংখ্যবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহার করেছেন।[১২০] গ্রন্থের শুরুতে ছাড়া তিনি আরো ২০ স্থানে তাসমিয়া এর ব্যবহার করেছেন।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো নেছারাবাদী (রহ.) প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআন শরীফের আয়াত ব্যবহার করেছেন। তিনি ৮০ স্থানে কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থানে সরাসরি আয়াত ব্যবহার না করে আয়াতের অনুবাদ ব্যবহার করেছেন।

---

১১৯ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, দোজাহানের সম্বল (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, মার্চ, ২০১৭), ৭ম মুদ্রণ, পৃ. ০৩

১২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

*হাদীসের উদ্বৃতি

নেছারাবাদী হুজুর কুরআনের মতোই হাদীস শরীফের ব্যবহার করেছেন। এছড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ ব্যবহার করেন।

*কিতাবের আলোচ্য বিষয়

পর্যালোচনা করলে জানা যায় গ্রন্থকার তার কিতাবের মধ্যে ১২টি বিষয় আলোচনা করেছেন

১. কালেমা ও কালেমার হাদিস মত সম্পর্কে আলোচনা।[১২১]

২. পাক-পাকিজা সম্পর্কীয় আলোচনা।[১২২]

৩. ওযু ও এতদ সংক্রান্ত নিয়মনীতির আলোচনা। [১২৩]

৪. গোসলের মাসয়ালা ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা।[১২৪]

৫. তায়াম্মুম সম্পর্কে আলোচনা।[১২৫]

৬. আযান ও একামত সম্পর্কে আলোচনা। [১২৬]

৭.মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা।[১২৭]

৮. নামায ও নামাযের বিভিন্ন মাসয়ালা বিষয় আলোচনা। [১২৮]

৯. রোজা সম্পর্কে আলোচনা। [১২৯]

১০. কুরবানী ও আকীকা সম্পর্কীয় আলোচনা।[১৩০]

১১. কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক বিভিন্ন দোয়া নিয়ে আলোচনা। [১৩১]

১২. কয়েকটি বিশেষ দরুদ শরীফ ও উহার খাছিয়াত নিয়ে আলোচনা। [১৩২]

---

১২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
১২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
১২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০
১২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
১৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

৩. তাজভীদুল কুরআনঃ

বাংলা ভাষী মুসলিম জনসাধারণকে আবশ্যক পরিমাণ তাজভীদ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার নিমিত্তে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এই পুস্তকটি রচনা করেন, নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে এটি ১৯৬৯ সনে ১ম প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং ২০১১ খ্রি. জানুয়ারি মাসে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪। এই পুস্তকটিতে ইলমে তাজভীদের যাবতীয় খুঁটিনাটি বিষয়গুলো সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা কুরআন শরীফ সহীহ শুদ্ধ রূপে পড়তে পারে। এ কিতাব সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- "আবশ্যক পরিমাণ এলমে তাজভীদ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর ও নারীর প্রতি ফরজ-অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের অনেকেই এই ব্যাপারে গাফেল। বাংলা ভাষাভাষী মুসলিম জনসাধারণকে আবশ্যক পরিমাণ তাজভীদ শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার নিমিত্ত বাংলা ভাষায় তাজভীদের কেতাব যত পরিমাণে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে ততই বেহতর। দ্বিতীয় জামেয়ায়ে-ই দারুচ্ছুন্নতের নেছাব কমিটির এক বৈঠকে তালিমের তাজভীদ সম্পর্কে আলাপ আলোচনার পর অনুভূত হয় যে, মাদ্রাসার নিম্ন শ্রেণি সমূহে মশকে কিরাতের যে ব্যবস্থা আছে উহার সহিত তালিমে তাজভীদের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয় এবং এ উদ্দেশ্যে ছাত্রদেরকে পাঠ উপযোগি একখানি সহজ বাংলা তাজভীদের কিতাব নেছাবভুক্ত করা আবশ্যক। উপরোক্ত দুই কারণে অনুপ্রাণিত হইয়া তাজভীদের এই সংক্ষিপ্ত কিতাবখানি সংকলন করা হইয়াছে।"[১৩৩]

কিতাবের বৈশিষ্ট্যঃ

***হামদ ও সানার মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা**

গ্রন্থকার আযীযুর রহমান নেছারাবাদী তার অত্র গ্রন্থখানা শুরু করেছেন আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ও নবী করীম (স.) তাঁর সাহাবীদের উপর দরুদের মাধ্যমে।[১৩৪]

*** বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

লেখক তার গ্রন্থে অসংখ্যবার তাসমিয়াহ এর ব্যবহার করেছেন।[১৩৫] গ্রন্থের শুরুতে ছাড়াও ভিতরে আরও অনেক জায়গায় তিনি বিসমিল্লাহ শরীফ ব্যবহার করেছেন।

---

১৩৩ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, তাজভিদুল কোরআন (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১১), ৮ম মুদ্রণ, পৃ.৩

১৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

***কুরআন শরীফের উদ্বৃতি**

গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থকার কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেছেন, তিনি ১০ জায়গায় কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে তার বক্তব্য দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন।

***হাদীসের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবের প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি ৫ স্থানে হাদীস শরীফ ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থানে তিনি হাদীসের এবারত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ ব্যবহার করেছেন।

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে-

* ১ম অধ্যায়ে ইলমে তাজভীদের পরিচয়, ইলমে তাজভীদের আবশ্যকতা, হরফ ও হরকত, মাখরাজ ও সিফাত, লাহান ও এলহান, তাজভীদের বিভিন্ন দরজা, ইলমে তাজভীদের আনুষঙ্গিক বিভিন্ন ইলমও তেলাওয়াতের আদব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৩৬]

*২য় অধ্যায়ে মাখরাজের বিবরণ, দাঁত এর বিবরণ, মাখরাজের স্থান, মাখরাজ পরিচয়ের সহজ উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৩৭]

*৩য় অধ্যায়ে সিফাতে জাতিয়ার বিবরণ দিয়েছেন।[১৩৮]

*৪র্থ অধ্যায়ে সিফাতে আরেজিয়া, মদ্দের বিবরণ, এদগাম, হামজাহ, গুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৩৯]

*৫ম অধ্যায়ে এলমে আওকাফ, ছাক্তার বিবরণ, এলমে কিরায়াত, কুরআন শরীফের সূরা ও আয়াত, কুরআন শরীফের পারা, মনজিল ও রুকু, ছাজদায়ে তিলাওয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৪০]

৪. ছোটদের কেরাত শিক্ষা:

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) তাজভীদুল কুরআন রচনা করার পর অনুভব করলেন নিম্ন শ্রেণির ছাত্রদের জন্য আরও সহজ ও সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তক রচনা করা জরুরি। তাই তিনি এ

---

১৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
১৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮
১৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

পুস্তকটি রচনা করলেন। পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৭৩ খ্রি. ১ম প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশেষ ২০২০ সনে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪। এই কিতাবটিতে ছোটোদের উপযোগী করে ইলমে তাজভীদের বিষয়গুলো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ কিতাব সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- "এলমে তাজভীদ শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর প্রতি ফরজ বিধায় মাদ্রাসার সর্বনিম্ন শ্রেণি থেকে তা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকা উচিত। সে পদ্ধতির কোন বাস্তব ব্যবস্থা নেই। এ অভাব দূরীকরণার্থে আমি ইতোপূর্বে তাজভীদুল কিতাব নামে একখানি কিতাব সংকলন করি। কিন্তু প্রকাশিত হওয়ার পরে দেখা গেল যে, তা পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠোপযোগী হয়নি। উক্ত শ্রেণিদ্বয়ের জন্য আরও সহজ এবং সংক্ষিপ্ত একখানা কিতাব দরকার। তাই এই ছোটোদের কিরাত শিক্ষা কিতাবখানি সংকলন করেছি।"[১৪১]

৫. ইসলামী জিন্দেগীর বুনিয়াদি চল্লিশ হাদিস:

এ কিতাব খানা হুজুর (রহ.) এর ব্যতিক্রম ধর্মী একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস সংকলন। এ কিতাবে নেছারাবাদী (রহ.) হাদীসে রাসুলের আলোকে ইসলামী জীবন যাপনের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছেন। এ পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৮৮ খ্রি. ১ম প্রকাশ করা হয় এবং ২০২০ সালে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা-৩২। অত্র পুস্তকটিতে দীন সম্পর্কীত চল্লিশটি নির্ভরযোগ্য হাদিস অনুবাদসহ বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মুসলমান এর দ্বারা উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। এ কিতাব সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- রাসুলে পাক (স.) এর এরশাদ মোতাবেক কেউ যদি দীন সম্পর্কিত ৪০টি হাদিস মানসপটে অঙ্কন করে নেয় অথবা পুস্তিকাকারে লিপিবদ্ধ করে সাধারণে প্রচার করে সেও পরকালে হাদিসে বর্ণিত ফকীহদের দলভুক্ত হওয়ার অধিকারী হতে পারে বলে আশা করা যায়। হাদিসে বর্ণিত সৌভাগ্য লাভের নিমিত্ত দীন সম্পর্কিত ৪০টি নির্ভরযোগ্য হাদিস অনুবাদ সহ সমাজে প্রকাশ করলাম"।[১৪২]

৬.তরিকায়ে সুন্নিয়া:

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) সুন্নত ও বিদায়াত তরীকা সমূহের ভিন্ন ভিন্ন এক ফিরিস্তি প্রদান করে অত্র পুস্তকটি রচনা করেন। নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে পুস্তকটি

---

১৪০ তাজভদিুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

১৪১ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ছোটদের ক্বিরাত শিক্ষা (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১৪), ৫ম মুদ্রণ, পৃ. ৫

২০০২ সনে প্রথম প্রকাশ হয় এবং ২০১৫ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়, এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-১০৪। এই বইয়ের মধ্যে একজন মানুষ হক চার তরীকা চিশতিয়া, কাদরিয়া, নকশাবন্দিয়া, মুজাদ্দেদিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে।

কিতাবের বৈশিষ্ট্যঃ

*** বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

লেখক তার গ্রন্থে অসংখ্যবার তাসমিয়াহ এর ব্যবহার করেছেন।[১৪৩] গ্রন্থের শুরুতে ছাড়াও ভিতরে আরও জায়গায় তিনি বিসমিল্লাহ শরীফ ব্যবহার করেছেন।

***খুতবা দিয়ে শুরু**

অত্র গ্রন্থখানার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এই গ্রন্থের শুরুতে নেছারাবাদী (রহ) এর সর্বশেষ বক্তৃতা সংযোজন করে তরীকা সম্পর্কে তার মতামত উল্লেখ করা হয়েছে।[১৪৪] যা একজন মুমিনের জীবনে পালন করলে তার জন্য আর ওয়াজ নসীহতের প্রয়োজন হয় না। অত্র কিতাবে তিনি শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

***হামদ ও সানার মাধ্যমে গ্রন্থের সূচনা**

নেছারাবাদী (রহ.) তার অত্র কিতাবখানার মূল বক্তব্য শুরু করেছেন সুন্নাত তরীকা অনুযায়ী মহান আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, নবী (স.) ও তার সাহাবীগণের উপর দরূদের মাধ্যমে।[১৪৫]

***দরূদ শরীফের আমল**

দরূদ শরীফ একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ আমল। যে আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ ও তার রাসুল (স.) এর প্রিয় পাত্র হয়ে উঠতে পারে। তরীকত পন্থীগণ এই আমল বেশি-বেশি করে থাকে। মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী তার অত্র কিতাবের মধ্যে বিভিন্ন তরিকায় যে দরূদ শরীফের আমল করা হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

***কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি**

গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থকার কিতাবের প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেছেন। তিনি ৩২ জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন।

---

১৪২ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, চল্লিশ হাদীস (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জুন, ২০১৪), ৩য় প্রকাশ, পৃ. ৩

১৪৩ তরীকাই ছুন্নিয়া, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

***হাদীসের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি ৫(পাঁচ) জায়গায় হাদীস শরীফের ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থানে তিনি হাদীসের এবারত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ ব্যবহার করেছেন।

***শের বা কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ৫ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

তিনি তার কিতাবে বিভিন্ন তরীকার আমল বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে যে সমস্ত বিষয় উল্লেখ করেছেন

* শরীয়ত, তরীকত, হাকীকত ও মারেফাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৪৬]

* সুন্নীয়া তরীকা ও বিদায়াত তরীকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৪৭]

* ৪ তরীকা ও তরীকার অজীফা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৪৮]

* জিকির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৪৯]

৭. আধুনিক বাংলা মিলাদ শরীফ

আমাদের দেশে প্রচলিত মিলাদ পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের কাছে দুর্বোধ্য ও পঠিত বিষয়সমূহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় অধিকাংশ সময়ই মিলাদের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হচ্ছে। তাই সমাজে প্রচলিত মিলাদকে মানুষের বোধগম্য করতে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) আধুনিক বাংলা মিলাদ শরীফ কিতাবখানা লিখেন। তিনি হজ্ব পালন কালে কাবা শরীফের প্রাক্তন ইমাম, বিখ্যাত আলেম, সায়্যেদ মুহাম্মদ বিন সাইয়্যেদ আলুবী আল মালিকী আল হুসাইনী আল মক্কী সাহেব (রহ.) এর কাছে দোয়া নেয়া ও মোলাকাতের জন্য উপস্থিত হলে তিনি তার লিখিত মিলাদ

---

১৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯
১৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩
১৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

বিষয়ক . الاحتفال بذكرى مولدالنبى الشريف নামক কিতাব খানা তাকে হাদিয়া দেন।[১৫০] অত্র বইয়ের শেষের দিকে উক্ত কিতাবখানর সংযোজন করা হয়েছে। কিতাবটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে সর্বপ্রথম ১৯৮০ সনে প্রকাশিত হয় এবং সর্বশেষ ২০১২ সনে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-১১০ । তিনি এই বইতে মীলাদ সম্পর্কিত বিষয় সমূহ যুগের চাহিদা অনুযায়ী কুরআন হাদীসের আলোকে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন।

কিতাবের বৈশিষ্ট্য

***বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

নেছারাবাদী (রহ) তার গ্রন্থে অসংখ্যবার বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহার করেছেন।[১৫১] গ্রন্থের শুরু ছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে দশ বার বিসমিল্লাহ শরীফ ব্যবহার করেছেন।

***কুরআন শরীফের উদ্ধৃতি**

গ্রন্থের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো গ্রন্থকার কিতাবের প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করেছেন। তিনি ১১ জায়গায় প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত ব্যবহার করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন।

***হাদীসের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তিনি ৯(নয়) জায়গায় হাদীস শরীফে ব্যবহার করেছেন। অনেক স্থানে তিনি হাদীসের এবারত উল্লেখ না করে শুধু মাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ ব্যবহার করেছেন।

***শের বা কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ২৩ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

অত্র কিতাবখানা মূলত দরূদ শরীফ ও মিলাদ শরীফ পাঠের হাকীকত ও ফজিলত বর্ণনা করার জন্য লিখিত হয়েছে তবে এর সাথে আরও কিছু বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে সেগুলো হলো-

* দরূদ শরীফ পাঠের হাকীকত ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে।[১৫২]

---

১৫০ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, আধুনিক বাংলা মিলাদ শরীফ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, মার্চ, ২০১২), ৭ম প্রকাশ, পৃ. ৮

১৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

* মিলাদ শরীফ পাঠের হাকীকত ও ফজীলত বর্ণিত হয়েছে।[১৫৩]

* মিলাদ শরীফ পাঠের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।[১৫৪]

* মিলাদ শরীফের ধারাবাহিক বর্ণনা দেয়া হয়েছে।[১৫৫]

* মোনাজাত পূর্ববর্তী দরূদ ও সালাম বর্ণিত হয়েছে।[১৫৬]

* দোয়া ও মোনাজাত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[১৫৭]

* রাসুল এ কারিম (স.) এর জন্ম দিবস পালন যায়েজ হওয়ার দলিল বর্ণিত হয়েছে।[১৫৮]

* মিলাদ শরীফ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়ার অভিমত আলোচনা করা হয়েছে।[১৫৯]

* মিলাদ শরীফে দাঁড়ানো প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।[১৬০]

কিতাবের উদ্ধৃতি

কুরআন হাদীসের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কিতাবের মধ্যে-

০১. তাওয়ারীখে হাবীবে ইলাহ

০২. ফুউযুল হারামাইন

০৩. ফয়সালায়ে হাফত মাসায়েল

০৪. বাহরে শরীয়ত

০৫. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ

০৬. ফতহুল বারী

০৭. কিতাবুর রুহ ইবনুল কাইউম

০৮. জামেউল আছার ফি মাউলিদিন নাবীয়ি আলমুখতার

০৯. আল লফজুর রায়ীক ফি মাউলুদী খাইরুল খলায়েক

১০. মাওরিদুস সাদী ফি মাওলিদুল হাদী

---

১৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
১৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
১৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
১৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
১৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭
১৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯
১৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

১১. আল মাওয়ারিদুল হানিয়াহ ফি মাওলিদি খাইরুল বারীয়াহ

১২. আল বাদরুত তালেউ

৮. এরশাদুন্নবী (স.) ও আখলাকুন্নবী (স.)

এ পুস্তকটি নেছারাবাদী (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৫৭ সনে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশেষ ২০১৫ সনে মুদ্রণ করা হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮। অত্র পুস্তকে এরশাদুন্নবী অধ্যায়ে ঈমান, ইসলাম, ইহসান, নেক আখলাক, হককুল ইবাদত প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আখলাকুন্নবী অধ্যায়ে নূরনবী (স.)-এর বদান্যতা, সহিষ্ণুতা, দয়া, ক্ষমা, বিনয়, নম্রতা , সাহস ও বীরত্ব, পানাহার ও পোশাক পরিচ্ছেদ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অত্র পুস্তকটি পাঠ কালে নবী(স.)-এর আখলাক সম্বন্ধে অবগত হয়ে ঈমানকে তাজা ও মজবুত করতে পারবে। এ কিতাব সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন-"ইসলামী জিন্দিগী যাপন করার নিমিত্ত হুজুরেপাক নূর (স.) এর এরশাদাত ও আখলাখ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং ঈমানকে তাজা ও মজবুত করার নিমিত্ত হুজুরের মু'জেজাত সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। এ ব্যাপারে অত্র পুস্তক কোন মুসলমানকে সামান্য কিছু সাহায্য করিলেও আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।"[১৬১]

১৬১ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, এরশাদুন্নবী(স.) ও আখলাকুন্নবী(স.) (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১৫), ২য় মুদ্রণ, পৃ. ৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আকায়েদ ও দর্শন মূলক রচনাবলি

৯. আহলে সুন্নতের পরিচয় ও আকায়েদ

মুসলমানদের আকিদাকে সহীহ করার জন্য এবং বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদকে যেমন কাদিয়ানী, ওহহাবী ও মওদূদী আকীদা থেকে মানুষদেরকে সতর্ক করার জন্য অত্র পুস্তকটি রচনা করেন।[১৬২] নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১ম প্রকাশ করা হয় ১৯৬৬ সনে, সর্বশেষ ২০২০ সনে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০ । অত্র পুস্তক খানা পাঠ করলে সকল মহলে আকায়েদের বিভ্রান্তি প্রতিরোধে সহায়ক হবে।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

নেছারাবাদী (রহ.) রচিত সকল কিতাবেই বিসমিল্লাহ শরীফের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে তুলনা মূলক অত্র গ্রন্থে বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার একটু কম। গ্রন্থের শুরুতে বিসমিল্লাহ শরীফ লিখিত রয়েছে।[১৬৩] এছাড়াও গ্রন্থের বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফের আমল লক্ষ করা যায়।

***তাসবীহ ও তাকবীরের আমল**

একজন সত্যিকারের মুমিনের জীবনে সর্বদা তাসবীহ এর আমল থাকা উচিত। নেছারাবাদী (রহ.) তিনি সর্বদা আল্লাহর জিকির তো করতেনই সাথে সাথে গ্রন্থ লেখাকালীন সময়ে তাসবীহ তাকবীর পাঠে ভুল করেন নি। তাই অত্র গ্রন্থে তিনি অসংখ্যবার তাসবীহ ও তাকবীর পাঠ করেছেন।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ৫টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

---

১৬২ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১২), ৮ম মুদ্রণ, পৃ. ৩

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতোই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।

অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ৬টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***শের বা কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ৫ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

***কিতাবের উদ্ধৃতি**

কুরআন হাদীসের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কিতাবের মধ্যে -

০১. বাহরুর রায়েক

০২. খোলাসা

০৩. কাজীখান

০৪. ফসুলে এমাদিয়া

০৫. খাজানাতুল ফেকাহ

০৬. খাজানাতুল মুফতিয়্যীন

০৭. মজমুয়োন্নাওয়াজেল

০৮. মিশকাত শরীফের শরহ মিরকাত

০৯. কবীরী

১০. হায়াতুল হায়ওয়ান কোবরা

১১. ফতোয়ায়ে আজীজীয়া

১২. ফতোয়ায়ে হাদীসীয়া

১৩. সীরাতে রুহুলে আরাবী

১৪. মাকতুবাতে ছালাছা

১৫. শামী

১৬. বাওয়ারেকে মোহাম্মাদীয়া আলা এরগামাতে নাজদীয়া

১৭. সাইফুল জব্বার

১৮. আত্তাসদীকত লিদাফিল বালাসীয়াত

১৯. সিহাব সাকিব

২০. ফয়জুল বারী

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়

লেখক তার কিতাবে যে সকল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করেছেন–

০১. মোমিন, কাফির, মুশরিক ও মোনাফিকের পরিচয় তুলে ধরেছেন।[১৬৪]

০২. কালিমাতে ইসলাম তুলে ধরেছেন।[১৬৫]

০৩. ঈমানের রোকন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৬৬]

০৪. ঈমানিয়াত, কালিমাতে কুফরে বর্ণনা দিয়েছেন।[১৬৭]

০৫. শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৬৮]

০৬. আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৬৯]

০৭. হক ফের্কা ও বাতিল ফের্কা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭০]

০৮. আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আকিদা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৭১]

০৯. পূর্ব জামানার কয়েকটি বাতিল ফের্কা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭২]

১০. বর্তমান জামানার কয়েকটি বাতিল ফের্কা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৭৩]

১১. সুন্নত ও বিদায়াত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭৪]

১২. বিদায়াত ও বদ রছম নিয়ে আলোচনা করেছেন। [১৭৫]

---

১৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
১৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৬৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬
১৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১৬৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১৬৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
১৭০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১৭১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
১৭২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
১৭৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
১৭৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
১৭৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

১০. ইসলাম ও তাসাওফ

এ পুস্তকটি হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ পুস্তকে তাছাওফ, পীর মুরিদী ও তরীকতের হাকীকত, জরুরত ও ফজিলত সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৬০ সনে প্রথম প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ২০১২ সনে প্রকাশ করা হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৯৬। এ পুস্তক পাঠ করলে পাঠক ইসলামী তাছাওফের প্রকৃত ব্যাখ্যা ও এর তাৎপর্য সুন্দরভাবে জানতে পারবে। এ কিতাব সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন-'এ কিতাব দ্বারা বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমানদিগকে তাছাওফ, পীর মুরিদী ও তরিকতের হাকিকত, জরুরত ও ফজিলত সম্পর্কে ওয়াকেফহাল করিতে সামান্য কিছু খেদমত হইলেও আমি আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।'[১৭৬]

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার**

গ্রন্থকার রচিত সকল কিতাবেই বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গ্রন্থের শুরুতে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিখিত রয়েছে।[১৭৭] এছাড়াও কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।
তিনি অত্র কিতাবে ৬৮টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ৫৭ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***শের বা কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

---

১৭৬ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ, পৃ. ৪

১৭৭ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা.৯।

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ১৬ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

***কিতাবের উদ্ধৃতি**

অত্র কিতাবে কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতির পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ সকল কিতাবের মধ্যে-

০১. ইমাদাদুল ফাতওয়া

০২. শামী

০৩. মাজাহেরে হক

৪. আশেয়াতুল্লোমায়াত

০৫. দুররোল মোখতার

০৬. তাফছীরে মাজহারী

০৭. তাফছীরে রুহুল বয়ান

০৮. এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন

০৯. তাকাশশোফ

১০. মেরকাত

১১. মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানী

১২. তাফসীরে মাদারেক

১৩. তাফসীরে মাজদী

১৪. তাফসীরে হক্কানী

১৫. ছোরারাল আছরার

১৬. তালীমুদ্দীন

১৭. এরশাদুত্ততালীবীন

১৮. কওলুল জামীল

১৯. সিরাতুল মুস্তাকীম

২০. ছায়ফুল গাউসুল আজম

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন

০১. আহকামে শরীয়াতের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭৮]

০২. ইলমে তাসাউফের সংজ্ঞা, তাছাউফের প্রকারভেদ, তাছাউফের জরুরত, ইলমে তাছাউফের ফরজিয়াত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৭৯]

০৩. ফাজায়েলে বয়ান তথা সৎ গুণরাজির বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮০]

০৪. রাজায়েলের বয়ান তথা অসৎ চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন।[১৮১]

০৫. তাছাউফ হাছেলের উপায় বর্ণনা করেছেন।[১৮২]

০৬. পীর কে? পীর মুরীদী ও পীর ধরার আবশ্যকতা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮৩]

০৭.কামেল পীর ও নাকেছ পীর, পীরে কামেলের আলামত, কামেল পীর তালাশ করার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮৪]

০৮. তরীকত, মকবুল তরীকা ও মরদুদ তরীকা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮৫]

০৯. চার তরীকা ও তরীকার মূল বিষয় (যিকির, মোরাকাবা, রাবেতায়ে কলব বিশশায়েখ) নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮৬]

১০. তরীকার চার ইমামের জীবনী আলোচনা করেছেন।[১৮৭]

১১. চার তরীকার শাজরা ও অজীফা নিয়ে আলোচনা করেছেন।[১৮৮]

১১. ইসলামী জিন্দেগী

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) অত্র পুস্তকে ইসলামী জীবন দর্শনের একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা তুলে ধরেছেন। নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে সর্বপ্রথম ১৯৮৫ সনে প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশেষ ২০১৯ সনে মুদ্রিত হয় । অত্র পুস্তকে ইসলামী জিন্দেগীর অত্যাবশ্যকীয় কতিপয় নীতি ও কর্মসূচি সংযোজন করা হয়েছে। তাই পাঠকগণ ইসলামী জিন্দেগী যাপনে মোটামুটি একটা দিশা পাইবেন। লেখক বলেন- "১৯৬৩ বঙ্গাব্দে (১৯৫৬

---

১৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
১৭৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
১৮০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১৮১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১
১৮২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
১৮৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৮৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
১৮৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
১৮৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯
১৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
১৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮

খ্রি.) ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর গাওছে জামান শাহ সুফি হাজী নেছার উদ্দিন আহমদ (র.) এর উপস্থিতিতে জমিয়তে হিজবুল্লাহর মজলিশে শুরার অধিবেশনে সপ্তমূলনীতিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর মূলনীতি সমূহের ব্যাখ্যা হিসাবে আমি ইসলামী জিন্দেগী নামক এই পুস্তকখানা সমাজের খেদমতে পেশ করি।"[১৮৯]

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু**

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) কিতাব লেখা শুরু করেছেন সুন্নত তরিকা অনুযায়ী বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম তথা তাসমিয়া ব্যবহার করে। গ্রন্থের শুরুতে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিখিত রয়েছে।[১৯০]এছাড়াও কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ৯৮টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতোই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ৪৭ টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***শের বা কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ৭ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

---

১৮৯ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, ইসলামী জিন্দেগী (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জুন, ২০১৩), ১৪তম সংস্করণ, পৃ. ৪

১৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

***কিতাবের উদ্ধৃতি**

কুরআন ও হাদীসের পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কিতাবের মধ্যে-

০১.রুদ্দুল মুখতার

০২. তাফসীরে রুহুল মাআনী

০৩. কিমিয়ায়ে সাআদাত

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

অত্র কিতাবের মধ্যে নেছারাবাদী (রহ.) যে সকল বিষয় আলোচনা করেছেন:

*ইসলাম, দীন ইসলাম ও ইসলামী জিন্দেগী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৯১]

* ইসলামী জিন্দেগীর ১০ টি মূলনীতি

০১.লিল্লাহিয়াত,

০২.একামাতে দীন,

০৩. ইতায়াত ও ইত্তেবায়ে রাসুল,

০৪. তাহছীলে এলমে দীন ও ছোহবাতে ছালেহীন,

০৫. যিকির ও ফিকির,

৬.তাবলীগে দীন,

০৭. আমরুবিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার,

০৮. জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ,

০৯. ইতিসাম বি হাবলিল্লাহ,

১০. ইতায়াতে উলিল আমর, সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[১৯২]

* ইসলামী জিন্দেগী গঠনে পঞ্চপথ প্রদর্শক নীতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

* একজন মুসলমানের তিন দফা কর্মসূচি:

১. ইসলাহে নফস,

২.ইসলাহে কওম,

৩. ইসলাহে হুকুমত, সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৯৩]

* আরকানে ইসলাম

---

১৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

১৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

১.কলেমা,

২. নামাজ,

৩. রোজা,

৪. যাকাত,

৫. হজ্ব, সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৯৪]

* রাজনীতি ও ইসলামী জিন্দেগী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৯৫]

* সিরাতে মুস্তাকিম ও সলফে ছালেহীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। [১৯৬]

* হিজবুল্লাহ ও হিজবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। [১৯৭]

১২. হাকীকতে এলমে দীনঃ

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) অত্র পুস্তকে ইলমে দীনের পরিচয়, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও হুকুম, শিক্ষার্থীদের কর্তব্য আলেম ওলামাদের কর্তব্য সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ্ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৬৫ খ্রি. ১ম প্রকাশ করা হয় এবং সর্বশেষ ২০১৩ সনে মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৪। এ পুস্তকের মাধ্যমে মাদ্রাসার ওলামা মাশায়েখ অনেক উপকার লাভ করবে।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যঃ

***বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু**

অত্র কিতাবের লেখক মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) তার কিতাব লিখা শুরু করেছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দিয়ে।[১৯৮] এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ এর ব্যবহার করেছেন।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ১৪টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও

---

১৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

১৯৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

১৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৯৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

১৯৮ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, হাকীকতে ইলমে দীন (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৩), ৫ম মুদ্রণ, পৃ. ৭

শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ৩৭টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ২০ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

কিতাবের উদ্ধৃতি

কুরআন হাদীসের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কিতাবের মধ্যে-

০১.এহইয়ায়ে উলুমুদ্দীন।

০২. আইনুল ইলম।

০৩. আশয়াতুল লুমায়াত।

০৪. ইমদাদুল ফতোয়া।

০৫. দুররুল মোখতার।

০৬. তালিমুল মুতায়াল্লিম।

০৭. মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী।

০৮. কওলুল জামীল ।

আলোচ্য বিষয়

অত্র কিতাবে মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

১. ফেতরী ইলম ও কসবী ইলম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[১৯৯]

২. দুনিয়াবী ইলম ও উহা শিক্ষা করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০০]

---

১৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

৩. দীনি ইলম ও উহার প্রকারভেদ এবং শিক্ষা করার হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০১]

৪. এলমে দীন, ওলামায়ে দীন ও মুতয়াল্লিমের ফজীলত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২০২]

৫. ফারায়েজুল মুতায়াল্লিমিন, আদাবুল মুতায়াল্লিমিন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২০৩]

৬. খেয়ারুল ওলামা ও শেরারুল ওলামা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০৪]

৭. ওলামায়ে হক্কানী, হক্কানী ওলামায়ে কেরামের শর্ত ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০৫]

৮. আদাবুল মুবাল্লিগীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২০৬]

১৩. তামীরে আখলাক

অত্র পুস্তকটি হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ। এ গ্রন্থে দীনের প্রকৃত শিক্ষা, মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব, সচ্চরিত্র গঠনের বিভিন্ন দিক, ফখর ও গেনার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। বইটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৬৮ সনে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং ২০১৫ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৬৮। এই বইটি শিক্ষাঙ্গণ সমূহে পাঠ্য করলে ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***আল্লাহ তায়ালার তারীফ বা প্রশংসা দিয়ে শুরু**

অত্র কেতাবের লেখক নেছারাবাদী (রহ.) কিতাব লিখা শুরু করেছেন আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশংসা দিয়ে। সুন্নত তরীকা অনুযায়ী তিনি হামদের পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম তথা তাসমীয়া ব্যবহার করেছেন।[২০৭] হামদের সাথে সাথে তিনি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.) এর উপর এবং তার সাহাবী বর্গের উপর দরূদ পাঠ করেছেন।

---

২০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০
২০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭
২০৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২০৭ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, তামীরে আখলাক (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫), ৫ম মুদ্রণ, পৃ. ৭

***কুরআনেরউদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ৩১টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ২৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ বহন করে। তিনি ১৩ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

কিতাবের উদ্ধৃতি

কুরআন হাদীসের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কেতাবের মধ্যে–

*জরবে কালীন

*ইত্তেহাদুল আশরাফ

*মাজালেছুল আবরার

*জেমানুল ফেরদৌস

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

অত্র কিতাবের মধ্যে নেছারাবাদী (রহ.) যে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন:

০১. তালীমে দীন ও চরিত্র গঠন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২০৮]

০২. মানুষের সৃষ্টিগত স্বভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২০৯]

---

২০৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২০৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

০৩. সচ্চরিত্র গঠন কেন করতে হবে , কিভাবে করতে হবে এবং মানুষের অভ্যাস নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১০]

০৪. ফখর ও গেনার পরিচয়, ফখর ও গেনার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২১১]

০৫. ফখর ও গেনার উভয় অবস্থায় হাদাতে তাইয়েবা লাভের উপায় এবং এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন।[২১২]

০৬. মওত বা পার্থিব মৃত্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৩]

০৭. আওয়ামেরে তাকলীফীয়া পালনে শক্তি সামর্থ দান এবং উহা ব্যবহারের পথ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৪]

০৮. ক্রোধ, ক্ষমা ও রাসুল (সা.) এর জীবনে ক্রোধ ও ক্ষমার সদ্ব্যবহার ও বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৫]

০৯. তাহমীদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২১৬]

১০. মুহাব্বত ও মুহাব্বতের প্রকারভেদ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৭]

১১. হুব্বে খোদা ও হুব্বে রাসুলের শ্রেণি বিভাগ নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৮]

১২. যেনা ও লাওয়াতাতের পরিণাম নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২১৯]

---

২১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬
২১৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
২১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
২১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
২১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
২১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সমালোচনা ও জীবনীমূলক রচনাবলি

১৭. মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) অনেক আওলিয়ায়ে কেরামের জীবনী গ্রন্থ রচনা করেন। যাতে করে তাদের দেখানো পথ ও মতে মানুষ চলতে পারে। সে রকম একটি পুস্তক হল মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি। তিনি ২য় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ, ইমামে রব্বানী , হযরত শায়েখ আহমদ সিরহিন্দী (রহ.) এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি বাংলাভাষী উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন যাতে প্রতিটি সংকটময় মুহূর্তে তারা নিজেদের হেফাজত করতে পারেন এবং উত্তরণের সঠিক পন্থা নির্ণয় করতে পারেন। পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৬০ সনে প্রকাশ করা হয় এবং ২০১৫ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা -৯৬।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু**

অত্র কিতাবের লেখক মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) তার কিতাব শুরু করেছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দিয়ে।[২২০] এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ এর ব্যবহার করেছেন।

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ০৭টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতোই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ১১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি

---

২২০ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মুজাদ্দেদে আলফেছানী রহ. এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ, পৃ. ৭

অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***কিতাবের উদ্ধৃতি**

কুরআন হাদীসের পাশাপাশি বিভিন্ন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। এ সকল কেতাবের মধ্যে

০১.মিরকাত

০২.কবীরী

০৩. মাকতুবাতে মুজাদ্দেদে আলফেসানী

০৪.এরশাদুত্তালেবীন

০৫. রেসালায়ে মরজিয়া

০৬. মাজমাউল বেহার

০৭. মাজমুয়ায়ে ফতুয়া

০৮. মাবদা ও মায়াদ

০৯. ইছবাতুন নবুয়াত

১০. রেছালায়ে তাহলীলীয়া

১১. আওয়ারেফুল মা'আরেফ

১২. কছছুল হেকাম

১৩. মুনতাখাতুব তাওয়ারীখ

১৪. মাহযার নামা

১৫. হালত মাশায়েখে নখশবন্দিয়া

কিতাবের আলোচ্য বিষয়

তিনি অত্র কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন-

১ম অধ্যায়ে-

০১. আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও বাতিল ফের্কা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২২১]

০২. তাহরীফে দীন ও তাজদীদে দীন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২২২]

০৩. মুজাদ্দেদীনে ইসলাম, মুজাদ্দেদে মিয়াত ও মুজাদ্দেদে আলফ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২২৩]

---

২২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

২২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

০৪. মুজাদ্দেদের গুণাবলী, মুজাদ্দেদীনের তালিকা সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন।[২২৪]

২য়অধ্যায়ে-

০১. মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) এর জন্ম, জন্মস্থান ও বংশ পরিচয় নিয়া আলোচনা করেছেন।[২২৫]

০২. তার পিতা মখদুম আব্দুল আহাদ (রহ.) এর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২২৬]

০৩. জন্মের পূর্বের কতিপয় ঘটনা ও শৈশব কালীন কতিপয় ঘটনা আলোচনা করেছেন।[২২৭]

০৪. ইলমে শরীয়ত ও তরীকত এর শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২২৮]

০৫. খাজা বাকী বিল্লাহর খিদমতে তিনি কী করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[২২৯]

৩য় অধ্যায়ে-

০১.বিভিন্ন ফেতনা(আকবরীনা, মাহযর নামা) ও ষড়যন্ত্রের মোকাবেলায় তার কর্ম পদ্ধতি ও কামিয়াবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩০]

০২. আকবরী ফেতনা তথা দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ভ্রান্ত মতবাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[২৩১]

০৩. আকবরী ফেতনা ও ফেতনা মোকাবেলায় হযরত মোজাদ্দেদ (রহ.) এর কর্মসূচি ও এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩২]

০৪. আকবরের মৃত্যু ও দীনে এলাহীর সমাপ্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩৩]

০৫. মুজাদ্দেদ (রহ.) এর তাজদীদী কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩৪]

০৬. ইসলাহে হুকুমতের লক্ষে মুজাদ্দেদ (রহ.) এর কয়েকটি পত্র তিনি তার অত্র পুস্তকে আলোচনা করেছেন।[২৩৫]

০৭.মুজাদ্দেদ (রহ.) এর বিরুদ্ধে যে সমস্ত ষড়যন্ত্র হয়েছে সে সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[২৩৬]

০৮. হযরত মুজাদ্দেদ (রহ.) এর পূর্ণ কামইয়াবী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩৭]

---

২২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬
২২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
২২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
২২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮
২২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
২২৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
২৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০
২৩১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
২৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
২৩৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২
২৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩
২৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪
২৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

৪র্থ অধ্যায়-

০১.মাকতুবাতে ইমাম রাব্বানীর কতিপয় নমুনা আলোচনা করেছেন।[২৩৮]

০২.তার কামালতী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৩৯]

০৩. মুকাশেফাত ও কারামত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৪০]

০৪. মুজাদ্দেদ (রহ.) এর ইন্তেকাল এবং ইন্তেকাল পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[২৪১]

১৮. মাওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালভী (রহ.) এর জীবনী:

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) সংগৃহীত জীবনী গ্রন্থ এটি, এটি সর্বশেষ ২০১২ খ্রি. মুদ্রণ করা হয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬। এ পুস্তকে ঈমামুদ্দীন নোয়াখালভী (রহ.) এর জীবন, তাবলীগে তার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তিনি অত্র পুস্তকটি সুন্নাত তরিকা অনুযায়ী তাসমীয়াহ এর মাধ্যমে শুরু করেছেন।[২৪২] তিনি অত্র পুস্তকে তার জন্ম ও বাল্যকাল, ইলম শিক্ষা, তরীকতের শিক্ষা, তালীম ও তাবলীগ, বিবাহ এবং দীন প্রচারে তার বিভিন্ন দেশে যাওয়ার ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

---

২৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

২৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

২৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

২৪২ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মাওলানা ইমামুদ্দীন নোয়াখালভী (রহ.) (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ফেব্রুয়ারি, ২০১২), ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর ভাষণ সংকলন

১৯. ইসলাম ও রাজনীতি

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর ১৯৫৬ সনে বাংলাদেশ জমিয়াতে হিযবুল্লাহ মজলিসে শুরা অধিবেশনে প্রদত্ত দুটি ভাষণ অবলম্বনে পুস্তকটি সংকলন করা হয়েছে। পুস্তকটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৫৬ সনে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং ২০১৭ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-২৪। এ পুস্তকটির দ্বারা ইসলামের রাজনীতি সম্পর্কে একটি সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভবপর হবে।

২০. আমাদের শক্তির ৩টি উৎস

১৯৮৩ সালের ১১ জুন ঝালকাঠি ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলনে হুজুর (রহ.) যে বাস্তব সম্মত জ্ঞান গর্ভ ভাষণ প্রদান করেন তাই আমাদের শক্তির তিনটি উৎস নামে প্রকাশ করা হয়। নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৮৩ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয়। সর্বশেষ ২০১৭ খ্রি. এটি মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২। বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ ও এ থেকে মুসলমানদের উত্তরণ ও শক্তি অর্জনের সঠিক পন্থা এই বইয়ের মধ্যে পাওয়া যায়।

গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য

***আল্লাহ তায়ালার তারিফ দিয়ে শুরু**

অত্র কিতাবে লেখক নেছারাবাদী (রহ.) কিতাব লেখা শুরু করেছেন আল্লাহ তায়ালার হামদ বা প্রশংসা দিয়ে। সুন্নত তরীকা অনুযায়ী তিনি হামদের পূর্বে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম ব্যবহার করেছেন। হামদের সাথে সাথে তিনি মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.) এর উপর এবং তার সাহাবী বর্গের উপর দরুদ পাঠ করেছেন।[২৪৩]

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী (রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন।

---

২৪৩ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, আমাদের শক্তির তিনটি উৎস (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), ৩য় মুদ্রণ, পৃ. ৭

তিনি অত্র কিতাবে ০৯টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ০৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

***কবিতা দ্বারা বক্তব্য সুসজ্জিত করণ**

গ্রন্থকার তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য অত্র কিতাবের বিভিন্ন স্থানে আরবী, ফারসি, বাংলা কবিতাংশ উদ্ধৃত করেছেন। যা তার কাব্য প্রীতি ও কাব্য সাহিত্যের উপর গভীর পাণ্ডিত্যর প্রমাণ বহন করে। তিনি ০৫ স্থানে কবিতা বা কবিতাংশ ব্যবহার করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

০১.অত্র কিতাবের মধ্যে মানুষ দুনিয়ার জিন্দেগীতে কিভাবে সুখ শান্তি লাভ করতে পারে, দুনিয়ায়ও যে, মুসলমানরা শুধু পরকালেই সুখ শান্তিতে থাকবে না দুনিয়াতেও সুখ শান্তিতে থাকবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২৪৪]

০২.বিজয় একমাত্র আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকেই আসে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে। [২৪৫]

০৩. মুসলমানদের শক্তি কিভাবে অর্জিত হবে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।[২৪৬] ০৪. তিনি শক্তির উৎস হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করেছেন লিল্লাহিয়াতকে, দ্বিতীয় উল্লেখ করেছেন জিহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ, তৃতীয় উল্লেখ করেছেন ইতিসাম বি হাবলিল্লাহ, এ সমস্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।[২৪৭]

২১. ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ

১৯৯৮ সনের ১৭ ও ১৮ মার্চ নেছারাবাদে সর্বদলীয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ নামে প্রকাশ করা হয়। এর পৃষ্ঠা

---

২৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
২৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৮
২৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

সংখ্যা ১৪। এ পুস্তকের মধ্যে মুসলমানদের মধ্যে পারস্পারিক বিভেদের কারণ, বর্তমান পরিস্থিতিতে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পদ্ধতি কীরূপ হতে পারে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিখিত রয়েছে।[২৪৮] এছাড়াও কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

২২. মত ও পথ

আলোচ্য পুস্তকে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) প্রচলিত বিভিন্ন মাছআলায় ফুরফুরা শরীফের হযরত পীর সাহেব (রহ.) এর মতামত উল্লেখ করেছেন। এটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৯০ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে এবং ২০১৬ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়েছে। এ পুস্তকে বিভিন্ন এখতেলাফী মাছায়েলে ইফরাত ও তাফরীত হতে মুক্ত হয়ে ফুরফুরার শাহসূফী আবুবকর ছিদ্দীক (রহ.) যে মত পোষণ করতেন তা বর্ণিত হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লিখিত রয়েছে। এছাড়াও কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ শরীফের ব্যবহার লক্ষ করা যায়।[২৪৯]

২৩. কিয়ামতের আলামত

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর একটি মৌলিক গ্রন্থ হল "কিয়ামতের আলামত"। এ পুস্তকে তিনি কিয়ামতের বিভিন্ন আলামত ইমাম মাহদী (আ.) এর আগমন, ঈসা (আ.) এর আগমন, অভিশপ্ত দাজ্জালের আত্ম প্রকাশ সম্পর্কে কুরআন হাদিস ভিত্তিক আলোচনা করেছেন। এটি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ থেকে ১৯৭৫ খ্রি. ১ম প্রকাশ করা হয় এবং ২০১৭ সনে সর্বশেষ মুদ্রিত হয়। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা-৮০। এই বইটি পাঠ করলে কিয়ামত সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

***বিসমিল্লাহ দিয়ে শুরু**

অত্র কিতাবের লেখক মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) তার কিতাব শুরু করেছেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম দিয়ে।[২৫০]

এছাড়াও তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিসমিল্লাহ এর ব্যবহার করেছেন।

---

২৪৮ ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

২৪৯ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, মত ও পথ (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারী, ২০১৪), একাদশ প্রকাশ, পৃ. ১০

২৫০ মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী, কেয়ামতের আলামত (ঝালকাঠি: নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, এপ্রিল, ২০১৭) ৯ম মুদ্রণ, পৃ. ১১

***কুরআনের উদ্ধৃতি**

নেছারাবাদী(রহ.) অত্র কিতাবে প্রয়োজন অনুযায়ী কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করেছেন। তিনি অত্র কিতাবে ৪৫টি আয়াত বা আয়াতাংশ উল্লেখ করে তার বক্তব্যকে দলিল ভিত্তিক ও শক্তিশালী করেছেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন স্থানে শুধু কুরআনের আয়াতের অর্থ উল্লেখ করেছেন।

***হাদিসের উদ্ধৃতি**

লেখক তার কিতাবে কুরআনের আয়াতের মতই প্রয়োজন অনুযায়ী হাদীস শরীফের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। অত্র কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় ২৪টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও তিনি অনেক স্থানে হাদীসের ইবারাত উল্লেখ না করে শুধুমাত্র হাদীস শরীফের অনুবাদ প্রদান করেছেন।

আলোচ্য বিষয়

তিনি অত্র কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করেছেন-

১) তিনি দীন ইসলাম ও ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণিভেদ নিয়ে আলোচনা করছেন।[২৫১]

২) হিযবুল্লাহ, হিযবুশ শয়তান ও মুযাবযাবিনের পরিচয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৫২]

৩) কিয়ামতের আলামত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৫৩]

৪) ইমাম মাহদী (আ.) নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৫৪]

৫) অভিশপ্ত দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করেছেন। [২৫৫]

৬) হযরত ঈসা (আ.) এর আগমন, খেলাফত গ্রহণ ও ঈসা (আ.) এর ইন্তেকাল পরবর্তী খেলাফত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[২৫৬]

০৭.হযরত ইস্রাফিল (আ.) এর সিঙ্গায় ফুৎকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৫৭]

---

২৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
২৫২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
২৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫
২৫৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
২৫৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
২৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

০৮. হাশরের ময়দান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।[২৫৮]

০৯. মাকামে মাহামুদার পরিচয়, রাসুলে কারিম (স.) এর শাফায়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। [২৫৯]

১০.বেহেস্ত, দোজখ, আমলনামা ও পুলসিরাত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[২৬০]

এ ছাড়াও তিনি আরও অনেক কিতাব লিখেন যেগুলোর পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেলেও বর্তমানে এর কোনো কপি পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলোর মধ্যে–

২৪. খোতবায়ে ছালেহিয়া

২৫. মালফুজাতে নেছারিয়া

২৬. ছারছীনা মরহুম পীর হযরত মাওলানা নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর অছিয়ত নামা

২৭. নেছারাবাদীর ওসিয়ত নামা

২৮. ইসলাম ও জিহাদ

২৯. সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের পরিণতি

৩০. ঈসরাইলী রাষ্ট্র ও মুসলমান

৩১. বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলমানদের কর্তব্য

৩২. এ যুগ মাহদী (আ.) এর যুগ

৩৩. সত্যের আহ্বান

৩৪. মুক্তির পথ

৩৫. প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিত

৩৬. সত্যের সংগ্রাম চলবে

৩৭. মানুষ কেন পাপ করে

৩৮. শরীয়তী বিচার

৩৯. দুর্নীতির সংজ্ঞা ও উহা দমনের কর্মসূচি

৪০. পিতা মাতা ও সন্তানের হক

---

২৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

৪১. কাশফুল

৪২. ঈমান তত্ত্ব

৪৩. বিপদ আপদের কারণ ও উহা হতে মুক্তিলাভের উপায়

৪৪. সহস্রাব্দের মোজাদ্দেদ

৪৫. হেদায়াতুল মুছলেমীন

৪৬. যিকরুন্নবী (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড)

৪৭. হুকুকুন্নবী

৪৮. কলেমাগো মুসলমান এক হও।

৪৯. এবার ঈদ সমস্যা

৫০. দিশারী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)

চতুর্থ অধ্যায়
দীনের বিভিন্ন বিষয়ে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

প্রথম পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে দীনি শিক্ষা ও পার্থিব শিক্ষা

ইলমের সংজ্ঞা

ইলম শব্দটির একাধিক অর্থ রয়েছে। এগুলোর একটি অর্থ হচ্ছে অনুধাবন ও উপলব্ধি করা। কেউ কেউ বলেন, ইলমের অর্থ সত্যায়ন করা। চাই তা ইয়াকিনী হোক বা অন্য কিছু। আর অভিধান অনুযায়ী ইলম এর এক অর্থ হচ্ছে التعقل বা আকলের সাহায্যে অনুধাবন করা। আর এই অর্থের ভিত্তিতেই ইলম শব্দটি কল্পনা, ধারণা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইলমের আরেকটি অর্থ হচ্ছে: দলিলের ভিত্তিতে মাসয়ালা আয়ত্ব করা।

বস্তুত: ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার সিফাত বা অনন্য গুণাবলিসমূহের একটি, যা ইলমের মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

ইলমের আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে ওলামায়ে কেরাম এর অন্তর্নিহিত একটি সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন। যেই সংজ্ঞায় ইলমের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃত ইলমের আলামত ফুটে ওঠে। যেমন, আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, বেশি বর্ণনা করা ও অধিক পরিমাণ আক্ষরিক জ্ঞান হাসিল করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার ভয়ের নাম।

ইমাম মালেক (রহ.) বলতেন, 'হেকমত ও আমল হচ্ছে একটি নূর। যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা তাকে পথ দেখান। আর বেশি বেশি মাসয়ালা জানার নাম ইলম নয়। এর একটি আলামত আছে। তা হচ্ছে, ইলমের বদৌলতে প্রতারণার এই জগত থেকে নিজেকে দূরে রাখা এবং চিরস্থায়ী জগতের দিকে ধাবিত হওয়া।'

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলতেন, ইলম হচ্ছে আমলের নাম। আর আমল হলো স্থায়ী জগতের স্বার্থে ক্ষণস্থায়ী জগত পরিহার করা।

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এলেমকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

(১) ফেতরী ইলম

(২) কসবী ইলম

ফেতরী ইলম: ফেতরী ইলম সম্পর্কে তিনি বলেন- "মাখলুক সৃষ্টিগত ভাবে আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে যে জ্ঞান লাভ করে উহা ফেতরী ইলম। ফেতরী ইলম কোনো মাখলুকের চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করিতে হয় না বরং আল্লাহ তায়ালাই কম বেশি সকল মানুষকে এই ইলমদান করেন।"[২৬১]

কসবী ইলম: কসবী ইলম সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন: 'মানুষ স্বেচ্ছায় বুদ্ধি খাটাইয়া এবং চেষ্টা ও সাধনা করিয়া যেই বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জন করে উহাকে বলা হয় কসবী ইলম। কসবী ইলম অর্জন করিতে মাখলুককে স্বেচ্ছায় চেষ্টা ও সাধনা করিতে হয়। সুতরাং যেই মাখলুক কসবী ইলম অর্জন করার ক্ষমতা লাভ করে, অন্যান্য মাখলুকের চেয়ে সেই মাখলুকের বুজুর্গী ও মর্তবা যে বেশি হইবে তাহাকে সন্দেহের অবকাশ নাই। মোট কথা কসবী ইলম একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্টের কারণেই ইনসান ও অন্যান্য মাখলুকের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। "[২৬২]

এরপর তিনি ইলমকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন

(১) দুনিয়াবী ইলম (পার্থিব শিক্ষা)

(২) দীনি ইলম (ধর্মীয় শিক্ষা)

১.দুনিয়াবী ইলম

দুনিয়াবী ইলমকে তিনি তিনভাগে ভাগ করেছেন–

প্রথম প্রকার

ঐ সকল বিদ্যা যাহা একদল লোকের জন্য না থাকিলে দুনিয়ায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ইহা ফরজে কেফায়াহ, যথা চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিদ্যা এবং দেশ রক্ষা ও দেশের উন্নয়ন সম্পর্কীয় জরুরি বিদ্যা।

দ্বিতীয় প্রকার

ঐ সকল বিদ্যা যাহা ইসলামে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নি:সন্দেহে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বিদ্যা, যথা যাদু বিদ্যা, ভেলকি বিদ্যা, জ্যোতিষী বিদ্যা এবং ঈমান ধ্বংসকারী বিদ্যা ও চরিত্রনাশক বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যা।

---

২৬১ হাকীকতে ইলমে দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

২৬২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

তৃতীয় প্রকার

ঐ সকল পার্থিব বিদ্যা যাহা জীবন রক্ষা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের হেফাজতের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় নহে, পক্ষান্তরে উহা ইসলামের বিধান অনুযায়ী নিন্দনীয় বা নিষিদ্ধ নহে বরং মুবাহ। যথা- আরবী ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ভাষা শিক্ষা করা, উচ্চাঙ্গের গণিত ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা, ইতিহাস, ভুগোল এবং দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি।[২৬৩]

৫. দীনি ইলম

দীনি ইলম সম্পর্কে তিনি বলেন, "আহকামে তাকলীফিয়া বা স্বেচ্ছায় প্রতিপালনযোগ্য শরয়ী আহকামের সমষ্টির নাম দীন। সুতরাং আহকামে তাকলীফিয়া সম্পর্কিত ইলেমকে বলা হয় দীনি ইলম। দীনি ইলম প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত-ইলমুল মোকাশাফা (তত্ত্বজ্ঞান) এবং ইলমুল মোয়ামালা (ব্যবহারিক বিদ্যা) ।"[২৬৪]

ইলমে মোকাশাফা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান। কিয়ামত পর্যন্ত এক শ্রেণির বিশুদ্ধ আত্মা বিশিষ্ট লোক এই ইলম লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু এই ইলম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা সম্ভব নহে। যাহারা আল্লাহর মা'রেফাত লাভ করিয়াছেন তাহারা ব্যতিত অন্য কেহ ঐ ইলম জানে না।

দীনি ইলমের দ্বিতীয় প্রকার ইলমে মোয়ামালা অর্থাৎ ব্যবহারিক ইলম, আল্লাহ পাকের নির্দেশাবলী যাহা পালন করিলে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং আল্লাহ তায়ালার নিষেধাবলী যাহা হইতে বিরত না থাকিলে মানুষ আল্লাহ হইতে বহু দূরে সরিয়া পড়ে। আল্লাহ তায়ালার এই নির্দেশাবলী ও নিষেধাবলী সম্পর্কীয় এলেমকে বলে এলমে মোয়ামালা।[২৬৫]

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) আহকামে শরীয়ত অর্থাৎ দীন শরীয়তের বিধান সমূহের উপর ভিত্তি করে ইলমকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত করেছেন-

(১) কালাম (ঈমান আকায়েদ)

(২) ফিকহ (জাহিরী আমল)

(৩) তাছাওফ (বাতিনী আমল)[২৬৬]

কালাম : আল্লাহ, রাসুল, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, পরকাল, তাকদীর, এবং পুনরুত্থান প্রভৃতির প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলা হয় "ঈমান ও আকায়েদ", ইহাকে কালামও বলা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কীয় ইলমকে বলে ইলমে আকায়েদ ও ইলমে কালাম।

---

২৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

২৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

২৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

২৬৬ ইসলাম ও তাছাওফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

ফিকহ : শরীয়তের কতকগুলি আমল আছে যা বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা আদায় করা হয়। যথা নামাজ ও রোজা প্রভৃতির বাহ্যিক ও আঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপ সমূহ। শরীয়তের এই বাহ্যিক ও আঙ্গিক ক্রিয়া কলাপকে বলা হয় জাহেরী আমল ও ফিকহ্ এবং এই সম্পর্কীয় ইলমকে বলা হয় ইলমে ফিকহ।

তাছাওফ: শরীয়তের কতকগুলো আমল আছে যাহা কলব বা দেল দ্বারা আদায় করা হয়। যথা তওবা, এনাবাত, ছবর, শোকর ইত্যাদি। এই সকল আমলে কলবিয়া বা আত্মিক ক্রিয়া কলাপকে বলা হয় বাতেনী আমল ও তাছাওফ এবং এই সম্পর্কীত ইলমকে বলা হয় ইলমে কলব, ইলমে আখলাক ও ইলমে তাছাওফ।[২৬৭]

মানব মাত্রই কলব বা দেলের মধ্যে ভালো এবং মন্দ, এই দুই প্রকার খাছলতের বীজ নিহিত আছে। দেহের ভালো খাছলত গুলি নেক কার্যাবলির মূল উৎস, পক্ষান্তরে মন্দ খাছলতগুলি পাপ কার্যাবলির মূল উৎস।

রাসুলে কারীম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন-'জানিয়া রাখ মানবদেহের মধ্যে একখণ্ড গোস্ত আছে। সেই গোস্তখণ্ড ভালো হইলে সর্ব শরীরই ভালো হয় আর ঐ গোস্তখণ্ড খারাপ হইলে সর্বাঙ্গ খারাপ হইয়া যায়। জানিয়া রাখ, সেই গোস্তখণ্ডের নাম ক্বলব বা দেল।' সুতরাং তাছাওফ হাছেল করা অর্থাৎ অন্তরকে সদগুণাবলি দ্বারা সুসজ্জিত করা এবং কুরিপুসমূহ হইতে পরিষ্কৃত করা যে অতীব জরুরি ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।[২৬৮]

দীনি ইলম অর্জন করতে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার

দীনি ইলম অর্জনে আগ্রহীকে সর্বদা আদব রক্ষা করে চলা আবশ্যক। আদব আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত এক বড়ো নিয়ামত। দীনি ইলম শিক্ষার্থীদের ছাত্রজীবনে কীভাবে কোন বিষয়ে আদব রক্ষা করতে হবে, যা না জানার কারণে তাদের ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। এসব বিষয় অনুধাবন করে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছাত্রদের জন্য কতিপয় আদব উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল–

(১) শিক্ষার্থীদের ওস্তাদ নির্বাচনের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়।

(২) যে মাদ্রাসার মুদাররিসীনে কেরাম উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ এবং বা-আমল ও পরহেজগার সে রূপ মাদ্রাসায় ভর্তি হবে।

(৩) শক্তি অনুযায়ী ওস্তাদের খেদমত করিবে এবং যথাসাধ্য ভক্তি ও সম্মান করিবে।

---

২৬৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৬৮ ইসলাম ও তাছাওফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

(৪) ওস্তাদের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্যাবলির প্রতি খুব দৃষ্টি রাখা উচিত–

(ক) ওস্তাদের বিনা জরুরতে তাহাদের সম্মুখে চলিবে না।

(খ) ওস্তাদের বিনা এজাজাতে তাঁহার দরবারে আগে বাড়াইয়া কোনো কথা বলিতে আরম্ভ করিবে না। তাহার সম্মুখে অতিরিক্ত কথা বলিবে না।

(গ) ওস্তাদের বিরক্তির সময় তাঁহার নিকট কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিবে না।

(ঘ) ওস্তাদের সময়ের প্রতি লক্ষ রাখিবে।

(ঙ) সর্বদা তাঁহার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করিবে এবং তাঁহার অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচিয়া থাকিবে।

(৫) ওস্তাদের আওলাদ ফরজন্দ এবং তাঁহার সহিত সংশ্লিষ্ট লোকদেরও যথাসাধ্য সম্মান করিবে।

(৬) কিতাব পত্রের খুব তাজিম করিবে।

(৭) ইলম ও হেকমতের কথা খুব ভক্তি সহকারে শ্রবণ করিবে।

(৮) শিক্ষার্থীকে অধ্যবসায়ী হইতে হইবে।

(৯) শিক্ষার্থীকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য কষ্ট ও পরিশ্রম করিতে হইবে এবং রাত্র জাগরণে অভ্যস্থ হইতে হইবে।

(১০) অলসতাকে অবশ্যই বর্জন করিতে হইবে।

(১১) ভুরি ভোজন করিবে না।

(১২) যথাসম্ভব শক্তিশালী খাদ্য ভক্ষণ করিবে এবং পরিমাণে কম খাইতে চেষ্টা করিবে।

(১৩) খাহেশাতে নফসানী তাবেদারী করিবে না।

(১৪) ইলমে দীন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ধৈর্যশীল ও কষ্ট সহিষ্ণু হইতে হইবে।

(১৫) ভদ্র-শিষ্ট দীনদার, পরহেজগার, বুদ্ধিমান ও স্বল্পভাষী সংগীদের সংশ্রবে থাকিবে।

(১৬) সর্বদা ইলমের আলোচনায় মগ্ন থাকিবে।

(১৭) অহংকার অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

(১৮) বিনয়ী হইতে হইবে।

(১৯) যাহা পাঠ করিবে উহা বারবার অধ্যায়ন করিয়া ইয়াদ করিবে।

(২০) সর্বদা আল্লাহর দরবারে ইলমে দীনের সহীহ বুঝ এবং হিদায়াতের জন্য দোয়া করিতে থাকিবে।

(২১) যখন কোনো বিষয়ের ইলম হাসিল হইবে, তখন আল্লাহ তায়ালার শোকর আদায় করিবে।

(২২) ছাত্রদের কাহারও সহিত অনাবশ্যক তর্ক বিতর্ক অথবা বেহুদা ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়।

(২৩) ছাত্রদের সর্বদাই কলম-কালি সঙ্গে রাখা উচিত এবং শিক্ষণীয় বিষয়ে কোন কথা শুনলেই উহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা উচিৎ।

(২৪) প্রথম সবক বুধবার আরম্ভ করিবে।

(২৫) অধিক পরিমাণে দরুদ শরীফ পাঠ করিবে।[২৬৯]

২৬৯ হাকীকতে ইলমে দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আকীদা ও আমলের ভিত্তিতে মুসলিমগণের শ্রেণি বিভাগ

আকীদা হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিষয়, কারো আকীদা ঠিক না থাকলে তার কিছুই ঠিক থাকে না। হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) মনে করতেন-"ইসলামী জিন্দেগীর ভিত্তি হল ঈমান ও আকায়েদ, ইমারত প্রতিষ্ঠিত হয় তার বুনিয়াদ বা ভিত্তির উপর, ভিত্তি সঠিক না হলে এর উপর প্রতিষ্ঠিত ইমারাত যত বড়ো ও যত উচ্চই হোক না কেন তা কস্মিনকালেও সঠিক হতে পারে না। এজন্য ইসলামে ঈমান ও আকীদার গুরুত্ব খুবই বেশি। ঈমান ও আকীদা দুরস্ত না করে জীবনভর ইবাদাত বন্দেগী করলেও ইসলামে তার কোন মূল্য নেই।"[২৭০]

মুসলিমগণ তাদের আকীদা ও আমল হিসেবে ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত

(১) কামিল মুসলিম

(২) ফাসিকুল আমল মুসলিম

(৩) ফাসিকুল আকীদা মুসলিম।

*** কামিল মুসলিম:**

কুরআনে কারীমের ভাষায় কামিল মুসলিমগণ চার শ্রেণিতে বিভক্ত। আল্লাহপাক এরশাদ ফরমায়েছেন:

انعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء والصالحين .

নিয়ামত প্রাপ্ত কামিল মুসলিমরা চার শ্রেণিতে বিভক্ত-নবী রাসুলগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ ও সালেহগণ, কাজেই আম্বিয়ায়ে কেরাম, সাহাবায়ে ইজাম, আয়েম্মায়ে মুজতাহিদীন, আওলিয়ায়ে কিরাম ও মুজাদ্দিদীন এবং তাদের পূর্ণ মুত্তাবেয়ীন সকলেই অনুকরণীয় অনুসরণীয় কামিল মুসলিম।

*** ফাসিকুল আমল মুসলমান**

যে সকল মুসলমান উপরি বর্ণিত কামিল মুসলমানের আকীদা অনুযায়ী আকীদা পোষণ করে কিন্তু তদানুযায়ী আমল করে না তারা ফাসিকুল আমল মুসলমান।

*** ফাসিকুল আকীদা মুসলমান**

যারা উপরে বর্ণিত কামিল মুসলমানের আকীদা বিপরীত কোন একটি আকীদা পোষণ করে তারাই হল ফাসিকুল আকীদা মুসলমান।"[২৭১]

---

২৭০ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫

২৭১ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানুষের শ্রেণি বিভাগ

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে মানব সমাজকে তিনদলে বিভক্ত করেন-

(১) হিযবুল্লাহ-আল্লাহর অনুগতদল বা বাধ্যগত দল

(২) হিযবুশ শয়তান-শয়তানের অনুগত ও বাধ্যগত দল

(৩) মুযাবযাবীন-সুবিধাবাদী দল যারা এদিকও না ওদিকও না।[২৭২]

সামাজিক দৃষ্টিকোণে মানব জাতির শ্রেণি বিভাগ

কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) বলেন–আজ আমরা অধিকাংশ মুসলমান সমাজ সেবার মহান দায়িত্ব বর্জন করে চলছি। অথচ প্রকৃত মুসলমান হওয়ার জন্য প্রত্যেক মুমিনের আল্লাহ ওয়ালা সমাজ কেন্দ্রিক হওয়া উচিৎ। আমার মতে দুনিয়ার সমগ্র লোক প্রথমত দুই শ্রেণিতে বিভক্ত। **প্রথম শ্রেণি:** আল্লাহ ওয়ালা ও **দ্বিতীয় শ্রেণি:** দুনিয়াদার। এ দুই শ্রেণির প্রত্যেক শ্রেণি আবার দু'দলে বিভক্ত। প্রথম দল সমাজকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় দল আত্মকেন্দ্রিক । এখন সব শ্রেণিকে মিলিয়ে বিশ্বের সমগ্র মানুষকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

(১) আল্লাহ ওয়ালা সমাজ কেন্দ্রিক

(২) আল্লাহ ওয়ালা আত্ম কেন্দ্রিক

(৩) দুনিয়াদার সমাজ কেন্দ্রিক

(৪) দুনিয়াদার আত্ম কেন্দ্রিক। এই শ্রেণি চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত দলই সর্বোত্তম।[২৭৩]

সুন্নত ও বিদয়াত সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

সুন্নাত ও বিদয়াত দুই বিপরীতার্থক আরবী শব্দ। ইসলামী তাহযীবের যতগুলো মৌলিক পরিভাষা রয়েছে, যে সব পরিভাষার উপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সম্যক অনুধাবন নির্ভরশীল, এ দু'টো শব্দ তারই মধ্যে গণ্য। এ দু'টো শব্দের সঠিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ এবং এ দু'টোর দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্ব মুসলিমের আকীদা ও আমল-আখলাক যাচাই ও পরখ করা একান্তভাবে জরুরি।

বস্তুত সুন্নাত ও বিদআত সম্পর্কে সম্যক অবগতির অভাবে দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও বিভিন্ন ভ্রান্তির জাল বিস্তার লাভ করে। অপরদিকে দীনের কাজ নয় বা কোনো প্রকার সাওয়াবের কাজ নয়, এমন কোনো বিষয়কেও অতি পুণ্যর কাজ মনে করা হয়। আমাদের সমাজে সুন্নত ও

---

২৭২ কেয়ামতের আলামত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা.১১-১২

২৭৩ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

বিদায়াতকে নিয়ে বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেছে। সুন্নত ও বিদায়াত সম্পর্কে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) বলেন- "সুন্নত রাসুলে পাক (স.)-এর অনুসৃত পন্থার নাম। যা রসূলে পাক (স.)-এর তরীকা ও অনুসৃত পথের সহায়ক তাও সুন্নতের সামিল। পক্ষান্তরে যা হুজুরের অনুসৃত নীতি ও তরীকার খেলাফ এবং যে সকল কাজ দ্বারা সুন্নতের বিলুপ্তি ঘটে তা বিকৃতি সাধিত হয় তাই বিদায়াত। এমন সব নেকের কাজে যার ভিত্তি হুজুরের যামানাতে বিদ্যমান ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে তার পন্থা ও পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধন বা তার উপর ভিত্তি করে নতুন কিছু করাকে ঘৃণিত বিদায়াত বলা যাবে না । যেমন ইসলামী তালিমের ব্যবস্থা হুজুর (স.)-এর যামানাতে বিদ্যমান ছিল, কিন্তু এরুপ পাঠ্যক্রম, রুটিন, ঘন্টা, ক্লাশ, ইত্যাদী তখন ছিল না। পরবর্তীকালে তালিমের সুবিধার্থে ক্রমান্বয়ে এটি করা হয়েছে। যেহেতু এটা হুজুরের যামানার নয় তাই বলে এটাকে ঘৃণিত বিদায়াত বলা যাবে না।"[২৭৪]

ইফরাত ও তাফরীত সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

ইসলাম হল মধ্যপন্থার ধর্ম। কোন কিছুতে বাড়াবাড়ি নেই এখানে। সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলার ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য মানবের সৃষ্টি। ধরাপৃষ্ঠে তাদের আগমন এ উদ্দেশ্যেই। কিন্তু এ ইবাদত করতে যেয়ে আমাদের অনেকে এর নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে যাই। ভারসাম্য রাখতে পারি না। নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখি না। ভুলে যাই পরিবার-পরিজন ও অন্যান্য মানুষদের প্রতি আমার দায়িত্ব-কর্তব্য। ইফরাত ও তাফরীত উভয়ই দীনের জন্য ক্ষতিকারক। তাফরীত পন্থিরা দীন ইসলামকে কাটছাট করতে চেষ্টা করে। ইফরাতপন্থী বা চরম আদর্শবাদীরা দীনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি এত গুরুত্বারোপ করে যে, উহার পরিণাম কওম ও মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করে।

ইফরাত ও তাফরীত সম্পর্কে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) বলেন- "দীন ইসলাম সিরাতে মুস্তাকিম অর্থাৎ মধ্যপন্থা, ইহাতে ইফরাত অর্থাৎ চরম আদর্শবাদ এবং তাফরীত অর্থাৎ অতিরিক্ত উদারতার কোন স্থান নেই। ইফরাত ও তাফরীত উভয়ই দীনের জন্য ক্ষতিকারক। তাফরীত পন্থিরা দীন ইসলামকে কাটছাট করতে চেষ্টা করে । এমনকি কোনো কোনো সময় তাদের হাতে দীন ইসলামের অবস্থা এতটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে যে, দীন গায়রে দীনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। ইফরাত বা চরম আদর্শবাদও দীনের জন্য কম মারাত্মক নয়। ইফরাতপন্থী বা চরম আদর্শবাদীরা দীনের খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি এত

২৭৪ আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ, প্রাগুক্ত,পৃ. ৫৮

গুরুত্বারোপ করে যে, উহার পরিণাম কওম ও মিল্লাতের জন্য অত্যন্ত মারাত্মক রূপ ধারণ করে।"[২৭৫]

ছোহবাতে ছালেহীন সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

মহান আল্লাহ তায়ালা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে নবী রাসুল প্রেরণ করেছেন। নবী রাসুলগণ পৃথিবীতে তাঁদের রিসালাতের বাণী প্রচার করেছেন। তাঁদের ইন্তেকালের পর এই দায়িত্ব অর্পিত হয় হক্কানী আলেম তথা ছালেহীনদের উপর। ছালেহীনদের পথ ও মত অনুস্মরণের জন্য মহান আল্লাহ ও নির্দেশ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক (সূরা তওবা-১১৯)। ছোহবাতে ছালেহীন সম্পর্কে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) বলেন "ছোহবাতে ছালেহীন অর্থাৎ ইলম অনুযায়ী বাস্তব জীবন (আমলী জিন্দেগী) গঠনের নিমিত্ত ছোহবাতে ছালেহীনের সাহচার্য লাভ করা। ইসলামী জিন্দেগী যাপনের নিমিত্ত তাহছীলে ইলমে দীনের ন্যায় ছোহবাতে ছালেহীনও অত্যন্ত প্রয়োজন। জীবন গঠনের নিমিত্ত কেবল কিতাবী শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, বরং কিতাবী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমলী তা'লীমও একান্ত প্রয়োজন। এজন্যই আল্লাহ তায়ালা মানুষের হিদায়াতের জন্য কেবল তার হুকুম আহকাম সম্বলিত আসমানী কিতাব নাযিল করেই ক্ষান্ত হননি, বরং মানুষের মধ্য হতে মনোনীত করে বহু পয়গম্বর দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। যেন তারা আসমানী কিতাব অনুযায়ী পুরোপুরি আমল করে মানুষদেরকে আমলী তা'লীম প্রদান করেন এবং ফয়েজ ছোহবাত দ্বারা তাদের ইসলাহে নফস করেন। হিদায়াতের ব্যাপারে আমলী তা'লীম ও ছোহবাতের প্রভাব যে খুব বেশি, ইহা কেউই অস্বীকার করতে পারে না। আমরা রাসুলে কারীম (স.) এর জামানার মুসলমান আর বর্তমান জামানার মুসলমানদের মধ্যে অনেক পার্থক্য দেখতে পাই। এ পার্থক্যের কারণ কী? কিতাবী ইলম তো হযরত (স.) এর জামানায় যা ছিল বর্তমানেও তাই অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। সুতরাং স্বীকার করতেই হবে যে, এ পার্থক্যের একমাত্র কারণ এই যে, হযরত (স.) এর জামানায় মুসলমানগণ হযরতের নিকট হতে যে আমলী তা'লীম হাসিল করতেন এবং তার সঙ্গ লাভ করে যে ফয়েজ ও তাওয়াজ্জু প্রাপ্ত হতেন, বর্তমান জামানার মুসলমানগণ তা হতে অনেক দূরে সরে পড়ছে"।[২৭৬]

---

২৭৫ ইসলামী জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৭৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলামী জিন্দেগীর রূপরেখা

ইসলামের মূল মর্মবাণী হলো মানুষের সর্বস্ব আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দেয়া। তার সব শক্তি, যাবতীয় কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাব-আবেগ, তার সব প্রিয় বস্তু; এক কথায় মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যা কিছু আছে সব কিছু আল্লাহ তাআলার কাছে অর্পণ করার নামই হলো ইসলাম। কুরআনের ভাষায় ইসলাম মানে আল্লাহর ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করে নেয়া যে জীবনাদর্শের লক্ষ তার-ই নাম ইসলাম। জীবনের প্রতিক্ষেত্রে, প্রতিস্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিধিনিষেধ পালন করা; তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা এবং এ লক্ষে নিজেকে বিলীন করে দেয়ার নামই ইসলাম। **ইসলামী জিন্দেগী** সম্পর্কে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) বলেন " ইসলামের বিধান কতিপয় রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এতে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের প্রত্যেক স্তর খোদায়ী বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এজন্যই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا . (سورة المائدة :٣)

সুতরাং পূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী ঐরূপ জীবনকে বলা হয় যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী গঠিত এবং সামগ্রিক ভাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত। অতএব ইসলামী আদর্শের অনুসরণকারী মুসলমানদের কর্তব্য এই যে, জীবনভর পূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী যাপন করবে। অর্থাৎ অল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকার করে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহর বিধান অনুযায়ী করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন

وما خلقت الجن والانس الاليعبدون .(سورة الزاريات:٥٦)

ইবাদাত শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত ইবাদাতের অর্থ আল্লাহ তায়ালার বশ্যতা স্বীকার করে তার বিধান মেনে চলা। সুতরাং উপোরোক্ত আয়াতের মর্মে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা জিন ইনসানকে এজন্য পয়দা করেছেন, যেন তারা জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার বিধান পালন করে এবং সারাজীবন একমাত্র তারই বশ্যতা স্বীকার করে চলে-এক কথায় পূর্ণ ইসলামী জিন্দেগী যাপন করে। ইসলামী জিন্দেগী

যাপনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত মৌলিক বিধান সমূহকে জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

১. লিল্লাহিয়াত

২. ইকামতে দীন

৩. ইতায়াত ও ইত্তেবায়ে রাসুল(স.)

৪. তাহসীলে ইলমে দীন ও ছোহবাতে ছালেহীন

৫. যিকির ও ফিকির

৬. তাবলীগে দীন

৭. আমরু বিল মারুফ নাহী আনিল মুনকার

৮. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ

৯. ই'তিসাম বি হাবলিল্লাহ

১০.ইতায়াতে উলিল আমর।"[২৭৭]

তাবলীগে দীনের আবশ্যকতা সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

তাবলীগে দীন ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। তাবলীগে দীন ছাড়া দীনের পরিপূর্ণতা পায় না। আল্লাহ তা'য়ালা যুগে যুগে যত নবী-রাসুল প্রেরণ করেছেন তাঁদের সকলেরই দায়িত্ব ছিল মানুষের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেয়া। তাবলীগে দীনের কাজ মানে ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজ। দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলামের ব্যাপক প্রসার ঘটে। মুসলিম জাতির বিস্তৃতি লাভ করে। বর্তমান সময়ে ইসলামের দাওয়াত অন্যের নিকট পৌঁছাবার গুরুত্ব অনেক। দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রগতি ও বিকাশ হয়। নির্মিত হয় ইসলামী সমাজ ও সভ্যতা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আমাদের আদি পিতা হযরত আদম (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (সা.)-এর মাধ্যমে যে ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল এর রশ্মি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে রয়েছে আল্লাহর পথে নিবেদিত প্রাণ, তাঁর প্রিয় নবী-রাসুলদের অক্লান্তত্যাগ, কুরবানি, পরিশ্রম ও ব্যাপক দাওয়াতি কাজ। উম্মাহর উত্থানে দীনি দাওয়াতি কাজের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বর্তমানে উম্মাহর পতনের কারণও হল তাবলীগে দীনের কাজের দুর্বলতা । সমাজের জাহেলিয়াত কুসংস্কার ও সকল অশ্লীলতার তালা দাওয়াতই খুলে দিতে পারে। একমাত্র ইলাহই মানবতার সকল সমস্যা ও অশান্তির শেকড় কেড়ে নিতে পারে। তাবলীগে দীন

২৭৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

ইসলামী সভ্যতা বিনির্মাণের প্রাথমিক সোপান। তাবলীগে দীন ইসলাম অনুশীলনের প্রেরণা যোগায়। তাবলীগে দীন উম্মাহর স্থবিরতা দূর করে। গতিশীলতা আনয়ন করে। তাবলীগে দীন সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন-"দীন ইসলাম সম্বন্ধে যাদের ধারণা যে রূপ তাবলীগে দীন বা তাবলীগে ইসলাম সম্বন্ধেও তাদের ধারণা ঠিক তদ্রুপ। এজন্যই দেখা যায় যে, আমাদের সমাজের অনেকেই তাবলীগে দীন বলতে কেবল কলেমা, নামাজ ও রোজা প্রভৃতিকে বুঝে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম যেমন ব্যাপক, তাবলীগে দীনও তদ্রুপ ব্যাপক । মানুষের ব্যক্তিগত জীবন যাপন এবং সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত আল্লাহ পাক যে সকল হুকুম আহকাম দিয়েছেন ইহাদের সমষ্টির নাম হল দীন ইসলাম। আর ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রকে ইসলামের বিধান অনুযায়ী গড়ে তোলার নিমিত্ত ইসলামের বিধান অনুযায়ী প্রচার কার্য চালানোর নাম হল তাবলীগে দীন বা ইসলাম প্রচার।"[২৭৮]

২৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
তাহরীফে দীন ও তাজদীদে দীন সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

তাহরীফ (বিকৃতি): আরবি تحريف শব্দটির অর্থ বক্র হওয়া, ঝুকে পড়া ও পরিবর্তিত হওয়া।

তাহরীফে দীন অর্থাৎ দীনের বিকৃতি সাধন। তাজদীদে দীন অর্থাৎ দীনের মধ্যে নতুনত্ব। তাহরীফে দীন ও তাজদীদে দীন সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- হযরত সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বানী অনুযায়ী, হযরতের ইন্তিকালের কিছুকাল পর হইতে বিভিন্ন বাতিল ফের্কার উদ্ভব আরম্ভ হইয়াছে। উহারা নিজেদের নফছানী গরজে অথবা ইফরাতী বা তাফরীতি মতাদর্শের কারণে তাহরীফে দীন অর্থাৎ দীনের বিকৃতি সাধনের অপচেষ্টা করিয়া আসিতেছে।

এই তাহরীফে দীন দুই প্রকার। (এক) তাহরীফে লফজী অর্থাৎ কুরআন হাদীসের এবারত পরিবর্তন করা, ইহা নিঃসন্দেহে কুফর। (দুই) তাহরীফে মানবী অর্থাৎ আহলে সুন্নত অল জামায়াতের খেলাফ কুরআন হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া। এ ধরনের তাহরীফের কারণে আহলে সুন্নত অল জামায়াত হইতে খারিজ হইতে হয় এবং হাদীসে বর্ণিত বাতিল ফের্কায় পরিগণিত হইতে হয়। মুসলিম জাহানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, প্রত্যেক হিজরী শতাব্দীর শেষ ভাগে বিভিন্ন বাতিল ফের্কার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হয় এবং ইফরাতী কিংবা তাফরীতী মতাদর্শের দরুন তাজদীদে দীন ও খেদমতে দীনের নামে খুব জোরে-শোরে তাহরীফে দীন চলিতে থাকে। এই ফেতনা ফাসাদের যুগে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সুষ্ঠু নেতৃত্বের অভাবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত কোনঠাসা হইয়া পড়ে এবং ওলামায়ে হক্কানী ও আওলিয়ায়ে কেরাম আহলে সুন্নত অল জামায়াত তথা খাঁটি ইসলামের হেফাজত ও হেমায়েত এবং বাতিল ফের্কার মোকাবেলার জন্য আল্লাহ পাকের মদদ তলব করিতে থাকেন এবং নিজেদের শক্তি সামর্থ অনুযায়ী বাতিলের মোকাবেলা করিতে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহলে সুন্নত অল জামায়াতের মধ্য হইতে কোনো আলেমে হক্কানীকে মুজাদ্দেদ হিসাবে কবুল করেন। যিনি সকল বাতিল ফের্কার সহিত মোকাবেলা করিয়া সকল বাতিল মতবাদ অর্থাৎ শিরক[২৭৯] ও বিদায়াতকে[২৮০] লংঘন করিয়া আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের অনুসৃত তরীকায়ে সুন্নত তথা খাঁটি ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন।[২৮১]

---

২৭৯ শিরক শব্দের অর্থ-অংশীদারিত্ব, অংশিবাদ, মিলানো, সমকক্ষ করা, সমান করা, শরিক করা, ভাগাভাগি করা। ইংরেজীতে Polytheism (একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস), partner.

হুব্বুল্লাহ ও হুব্বে রাসুল সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলকে মহব্বত করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের মহব্বত সকল মহব্বতের উর্ধ্বে রাখাও অত্যাবশ্যক। কারণ রাসুল আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেন, যে সবকিছু থেকে আমাকে বেশি মহব্বত না করবে সে মুমিন হতে পারবে না। এ থেকে বুঝা যায় যে, ঈমানের অস্তিত্বের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর

পরিভাষায়,

هو اتّخاذ شريكٍ أو نِدٍّ مع الله –سبحانه وتعالى– في كونه ربَّاً خالقاً مُتصرّفاً في الكون والخلق، أو في عبادة أحدٍ معه من البشر أو الكائنات أو المخلوقات أو الجمادات، أو في الأسماء والصّفات بإضافة ما لم يُسمّ به نفسه من الأسماء ولم يتَّصف به من الصِّفات، أو أن يُعطي صفةً من صفات الله أو اسماً من أسمائه لأحدٍ من الخلق

আমলগতভাবে আল্লাহর সাথে ইবাদতের ক্ষেত্রে অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে আল্লাহর অংশিদার/সমতুল্য বা সমান বানানোকে/করাকে শিরক বলে।

রব ও ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সহিত আর কাউকে শরীক (অংশিদার) সাব্যস্ত করার নামই শিরক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উলুহিয়াত তথা ইলাহ হিসাবে আল্লাহর সাথে শরীক করা হয়। যেমন আল্লাহর সাথে অন্য কারো নিকট দোয়া করা কিংবা বিভিন্ন প্রকার ইবাদত যেমন যবেহ, মান্নাত, ভয়, কুরবানী, আশা, মহব্বত,আনুগত্য, ভরসা ইত্যাদি কোনো কিছু গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। আল্লাহকে ডাকার মত অন্যকে ডাকা, আল্লাহকে ভয় করার মত অন্যকে ভয় করা, তাঁর কাছে যা কামনা করা হয়, অন্যের কাছে তা কামনা করা। তাঁকে ভালোবাসার মত অন্যকেও ভালোবাসা।

শিরক দুই প্রকার: ১. শিরকে আকরার (বড়ো শিরক) ও ২.শিরকে আসগার (ছোটো শিরক)

১. শিরকে আকরার (বড় শিরক): যা বান্দাকে মিল্লাতের শিরকে আকবর হলো গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া যে কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা বস্তুর উদ্দেশ্যে কোনো ইবাদত আদায় করা, গাইরুল্লাহর উদ্দেশে কুরবানী করা, প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করা এবং বিপদ দূর করার ন্যায় যে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না সে সব ব্যাপারে আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে আশা করা।

২. শিরকে আসগার (ছোট শিরক): শিরক আসগার বান্দাকে মুসলিম মিল্লাতের গণ্ডী থেকে বের করে দেয় না, তবে তার একত্ববাদের আক্বীদায় ত্রুটি ও কমতির সৃষ্টি করে। এটি শিরকে আকবারে লিপ্ত হওয়ার অসীলা ও কারণ। এ ধরণের শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি যদি শিরকের উপরই মৃত্যুবরণ করে, এবং তা থেকে তওবা না করে থাকে, তাহলে সে চিরস্থায়ী ভাবে দোজখে অবস্থান করবে।

২৮০ বিদয়াতের শাব্দিক অর্থ হল নতুন সৃষ্টি, নতুন আবিষ্কার। অর্থাৎ যার কোনো অস্থিত্বই ছিল না তার সৃষ্টিকে বিদয়াত বলে। "বিদয়াত হলো-নমুনা ব্যতীত সৃষ্ট জিনিস ।" (هي العبادة المحدثة، التي ما جاء بها الشرع)

বিদয়াতের পারিভাষিক সংজ্ঞা:

বিদয়াতের শরীয়তী অর্থ সম্পর্কে বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফক্বীহ্ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন "প্রকৃতপক্ষে বিদয়াত হলো-এমন জিনিসের আবির্ভাব, যার নমুনা হুজুর পাক ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় ছিল না।" (দ্র. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী, ওমদাতুল ক্বারী শরহে বুখারী, খ.৫, পৃ-৩৫৬)

বিদয়াত সে কাজকে বলা হয়, যা বিগত কোনো কিছুর অনুকরণ ছাড়া করা হয়।

বিদআত ২ প্রকার:

১. বিদআতে হাসানাহ (ভালো বিদয়াত)

২. বিদআতে সায়্যিয়াহ (মন্দ বিদয়াত)

২৮১ মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা. ৯-১১

রাসুলের মহব্বত অত্যাবশ্যক। আর আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের মহব্বত ছাড়া ঈমানের স্বাদও অনুভব করা সম্ভব হয় না।

পৃথিবীর তাবৎ বিষয়ের ঊর্ধ্বে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে স্থান দেয়া এবং তাঁদেরকে সবচে বেশি মহব্বত করা। কেননা এর অন্যথা হলে কোনো মুমিন মুমিন হতে পারে না। সূরা তাওবার ২৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "বল, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যার মন্দা হওয়ার আশঙ্কা তোমরা করছ এবং সে বাসস্থান, যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তাঁর রাসুল ও তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ তাঁর নির্দেশ নিয়ে আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।" (সূরা আত-তাওবা:২৪)। আল্লাহ ও তার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে প্রেম ভালোবাসা ব্যতিরেকে ইমান ইসলামের দাবীদারদের আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়ত নসীব হয় না। এমন সব লোক বাহ্যিকভাবে মুসলমান নামধারী হওয়া সত্বেও মূলত ফাসিক ও গোমরাহ।

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) মহব্বতকে নিম্নলিখিত কয়েকভাগে বিভক্ত করেছেন

(ক) মহব্বতে মাহমুদা (প্রশংসনীয় মহব্বত): মহব্বতে মাহমুদার (প্রশংসনীয় মহব্বতের) মধ্যে হুব্বে খোদা ও হুব্বে রাসুল শীর্ষস্থানীয়। কেননা আল্লাহ ও রাসুলকে সর্বাধিক মহব্বত না করা পর্যন্ত কোনো মানুষ মুমিন নামে অভিহিত হইতে পারবে না।

(খ) মহব্বতে মজমূমা: মহব্বতে মজমূমার মধ্যে শয়তানের মহব্বত, মুয়ামালাতে কুফফর, গুণাহের প্রতি মহব্বত, মুয়ামালাতে ফুচ্ছাক, আজনবী আওরাত ও আমরুদ বালককে মহব্বত অন্যতম।

(গ) মুবাহ মহব্বত।[২৮২]

২৮২ তামীরে আখলাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৮।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলাম ও রাজনীতি

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য ইসলামকেই একমাত্র দীন হিসাবে মনোনীত করেছেন। তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে একমাত্র মনোনীত দীন হলো ইসলাম' (সূরা আল ইমরান আয়াত নাম্বার:১৯)। মুহাম্মাদ (স.)-এর জীবদ্দশাতেই দীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন- 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম' (সূরা মায়েদা আয়াত নাম্বার:৩)।

অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসুলুলল্লাহ (স.)-এর জীবদ্দশাতেই দীন-ইসলাম পূর্ণতা লাভ করেছে, যাতে মানুষের সার্বিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণিত হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, ধর্ম কি রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত কিনা। নিঃসন্দেহে ধর্ম রাজনীতিতে একটা শক্তিশালী প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তবে ধর্মের আলোকে রাজনীতি হচ্ছে, না কি রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে সেটা আলোচনার বিষয়। বর্তমানে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে পুঁজি করে জনগণের সমর্থন আদায়ে ধর্মকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। তবে ধর্মের মূলনীতির ভিত্তিতে পৃথিবীর কয়েকটা দেশে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মের মূলনীতি সমূহের কতটুকু ধরে রেখে রাজনীতি করা হচ্ছে তা অপেক্ষিক বিষয়। তবে ইসলাম ধর্ম যেহেতু পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা তাই ইসলাম ধর্মের আলোকে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে অনেক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ।

ইসলাম ও রাজনীতি সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- "মানবজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত রাজনীতি ও একামতে দীন ও তাবলীগে দীনের অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় এবং নিঃসন্দেহে তা ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন-যাপন এবং সমাজ গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার নিমিত্ত আল্লাহ তায়ালা যে সকল হুকুম আহকাম দিয়েছেন, সেগুলোর সমষ্টির নাম হল-দীন ইসলাম। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের মত রাজনীতি সম্পর্কেও ইসলামে পরিষ্কার রূপে বিধি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় ইসলামী জীবন যাপনকারীদেরকে রাজনৈতিক ব্যাপারেও ইসলামের বিধি ব্যবস্থা মেনে চলতে হবে। আমার মতে রাজনীতির তিনটি দিক আছে–

(১) সরকার বা রাষ্ট্রের দায়িত্বঃ সরকার বা যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, তাদের কর্তব্য হল ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করা। এটা নিঃসন্দেহে ইকামতে দীনের অন্তর্ভুক্ত।

(২) পরোক্ষ রাজনীতিঃ রাজনৈতিক ব্যাপারে দেশ ও জাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শন (রাহনোমায়ী) করতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জেদ্দু ও জুহদ (চেষ্টা ও সাধনা) করা বর্তমান

রাজনৈতিক পরিভাষায় এ ধরনের রাজনীতিকে বলা হয় পরোক্ষ রাজনীতি। পরোক্ষ রাজনীতি নিঃসন্দেহে তাবলীগে দীনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা আ'মর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার। অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎ কাজের নিষেধ করা। শক্তি ও সাধ্যানুযায়ী প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি ফরজে আইন এবং এ খেদমত ব্যাপকভাবে আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্তে একদল মুসলমানদের প্রস্তুত থাকা ফরজে কেফায়াহ।

(৩) প্রত্যক্ষ রাজনীতি: রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের জন্য জেদ্দু ও জুহদ (চেষ্টা-সাধনা) করা। বর্তমান রাজনৈতিক পরিভাষায় একেই বলা হয় প্রত্যক্ষ রাজনীতি। যে সকল দল এ ধরনের রাজনীতি করে। তাদেরকে রাজনৈতিক পার্টি নামে অভিহিত করা হয়। এটা ইকামতে দীন ও তাবলীগে দীনের অন্তর্ভুক্ত কি-না তাতে মতভেদ থাকলেও মুহাক্কেকীন ওলামায়ে কিরামের সিদ্ধান্ত হল, এটা দুনিয়াবী গরযে হলে নিছক দুনিয়াবী হবে। আর ইক্বামতে দীন ও তাবলীগে দীনের উদ্দেশ্যে হলে তা ইকামতে দীন ও তাবলীগে দীনের মধ্যে শামিল হবে।

তবে এধরনের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের পূর্বে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে এর দ্বারা দীনের উপকার হবে না ক্ষতি হবে? অন্যথায় হিতে বিপরীত ঘটতে পারে। যারা এধরনের রাজনৈতিক ও ইক্বামতে দীন এবং তাবলীগে দীনের ওছীলা ও জরীয়া হিসেবে ইক্বামতে দীন ও তাবলীগে দীনের অন্তর্ভুক্ত বলে বিশ্বাস করেন, পরিস্থিতির বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ এবং এর দ্বারা দীনের ফায়দা হবে না ক্ষতি হবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। এতে মতভেদের অবকাশ আছে বলেই কোন পরিস্থিতিতে যদি এ ধরনের রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করা মোনাছেব কি গায়রে মোনাছেব তা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়। তাহলে কোন পক্ষের প্রতি দোষারোপ করা বা কটাক্ষ করা উচিত হবে না।

আমরা মনে করি পরোক্ষ রাজনীতি ও প্রত্যক্ষ রাজনীতি উভয় পদ্ধতিতেই ইসলাহে হুকুমাত খেদমত আঞ্জাম পেতে পারে বরং কোন সময় পরোক্ষ রাজনীতি অধিকতর ফলপ্রসূ হয়ে থাকে।[২৮৩]

২৮৩ ইসলাম ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
পীরের অনুসরণ সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

যাহেরী আমল তথা দেহের বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আমল ও তার মাসয়ালা-মাসায়িল শিক্ষা করার জন্য শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। উস্তাদ ছাড়া এসব কাজ সঠিকভাবে হয় না। আর বাতেনী আমল যেগুলো তাসাউফ ও ত্বরীকতের মধ্যে বর্ণনা করা হয়, সেগুলোর ইলম হাসিল করা এবং সে অনুপাতে আমল করার জন্য উস্তাদের প্রয়োজন তার চেয়েও অধিক। আধ্যাত্মিক ব্যাধি ও মন্দ চরিত্রসমূহ বোঝা এবং সেগুলোর চিকিৎসা ও সংশোধন করা পীর বা মুরশীদ ছাড়া সম্ভব হয় না। তাই যে ব্যক্তি এ পথে পা রাখবে, তার জন্য মুরশীদের সন্ধান করা জরুরি। সন্ধান করে এ ধরণের পীর পেলে, তাঁর শরণাপন্ন হবে এবং পরিপূর্ণরূপে তার শিক্ষা ও নির্দেশনা মেনে চলবে। কেউ যখন পীরের শিক্ষা বা ছবক অনুযায়ী আমল করতে আরম্ভ করবে, তখন সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, নিজের যাহেরী ও বাতেনী আমল ছহীহ করতে জায়গায় জায়গায় পীর ও মুরশিদের প্রয়োজন পড়ে।

আমাদের সমাজে অনেকে পীর শব্দটি নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। কেউ পীরের অন্ধ অনুসরণ করে অর্থাৎ পীরবাদকে পীর ভক্তি মনে করে। আবার কিছু মানুষ শরীয়ত সম্মত পদ্ধতিতে পীরভক্তিকেও পীরবাদ মনে করে। হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এই দুটো আইডিয়াকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করেছেন- "পীর ভক্তি ওয়াজীব আর পীরবাদ অর্থাৎ শরীয়ত বর্জন করে পীরের আনুগত্য শিরক।"[২৮৪]

নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- "যেকোন ইলম শিক্ষা করিতে উক্ত ইলমে পারদর্শী কোনো ওস্তাদের শরণাপন্ন হইতে হয়, ইহাই দুনিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়গুলো পর্যন্ত ওস্তাদের তা'লীম ব্যতীত সাধারণত শিক্ষা করা সম্ভবপর হয় না। অতএব ,তাছাওফ ও তরীকত শিক্ষা করার জন্য ইলমে জাহের ও ইলমে বাতেনে পারদর্শী কোন পীর তরিকতের নিকট তা'লীম হাছেল করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কাহারও দ্বিমত থাকিতে পারে না। কাজেই তাযকিয়ায়ে বাতেন (আত্মশুদ্ধি) ও ইছলাহে নফছের (আত্ম সংশোধনের) নিমিত্ত এমন লোকের ছোহবত এখতিয়ার করা, যিনি ফাজায়েল (সদগুণরাজি) দ্বারা স্বীয় অন্তরকে সুসজ্জিত এবং কুরিপুসমূহ

২৮৪ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

হইতে অন্তরকে পরিষ্কৃত করিয়াছেন, ইহা অতীব জরুরি, ইহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না।[২৮৫]

শয়তান থেকে আত্মরক্ষার উপায় সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

শয়তান মহান আল্লাহর থেকে বিতাড়িত হয়ে পৃথিবীতে আসার পর মানুষকে প্রতারিত করে জাহান্নামে নেয়ার মিশন শুরু করেছে। শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। আল্লাহ তায়ালা শয়তান থেকে বার বার সতর্ক করেছেন। শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে থাকে তার কয়েকটি দিক হলো-

*ইবাদাতে ব্যাঘাত সৃস্টি করা
*প্রভাব বিস্তার করা
*মন্দ ও অশ্লিল কাজের নির্দেশ
*ধোঁকা দেওয়া
*মানবের শিরা-উপশিরায় বিচারণ
*প্ররোচনা দেওয়া
*পথভ্রষ্ট করা
*নিজেদের দলভুক্ত করার প্রচেস্টা
*সরল পথ থেকে বিমুখ করা
*পাপকে সৌন্দর্যমন্ডিত করা

শয়তান থেকে কিভাবে আত্মরক্ষা পাওয়া যায় এ সম্পর্কে নেছারাবাদী (রহ.) বলেন- "যে সকল আমল শয়তানের হাত হতে রক্ষা পাওয়ার অবিচ্ছেদ্য ঢাল স্বরূপ এখন আমি সেগুলো আপনাদের খেদমতে আরজ করছি। আমার বিশ্বাস যার হাতে এ ঢাল থাকবে না সে মস্ত বড়ো আবেদ ও দরবেশ হলেও শয়তান তাকে যে কোন মুহূর্তে গোমরাহ করতে সমর্থ হবে।

প্রথমত: আল্লাহ তায়ালার খালেস বান্দা হতে হবে। কেননা শয়তান বলেছে "হে খোদা আমি আপনার খালেস বান্দাগণ ব্যতীত আর সকলকে গোমরাহ করতে সমর্থ হব।" আল্লাহ তায়ালার খালেস বান্দা হতে হলে আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দি হাসিল করাকেই জীবনের একমাত্র মাকসুদ ও লক্ষ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার রেজামন্দী হাছেল করার উদ্দেশ্যে।

দ্বিতীয়ত: শয়তানের হাত থেকে নাজাত লাভ করতে হলে পূর্ণ ঈমানদার হতে হবে। বিশেষত আখেরাত অর্থাৎ পরকালের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

---

২৮৫ ইসলাম ও তাছাওফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

তৃতীয়তঃ হামেশা আল্লাহ তায়ালার জেকেরে মশগুল থাকতে হবে।"[২৮৬]

সংঘবদ্ধ জীবন যাপনের গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সে একাকী বসবাস করতে পারে না। সকলে মিলেমিশে সমাজবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করে। এই সংঘবদ্ধ জীবন যাপন পদ্ধতিকে আমরা জামা'আতবদ্ধ জীবন বা সাংগঠনিক জীবনের সাথে তুলনা করতে পারি। উল্লেখ্য যে, কিছু মানুষ বিশেষ লক্ষ ও উদ্দেশ্য নিয়ে যখন একজন নেতার অধীনে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালায় তখন তাকে জামা'আত বলা হয়। মুসলিম জাতিকে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশ দিয়ে মহান রাব্বুল আলামিন বেশ কিছু আয়াতও নাযিল করেছেন। একইভাবে মানবতার মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স.) বিভিন্নভাবে এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ এ পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নও বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে গেছেন বিধায় সংঘবদ্ধ জীবন যাপন মুসলিম উম্মাহর জন্য অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। একজন মুসলমানকে বহু জাহেরী ও বাতেনী দুশমনের মোকাবিলা করে বাঁধা বিঘ্ন বিপদ ও প্রতিকূলতার বহু দুর্লংঘনীয় পাহাড় অতিক্রম করে আদর্শ জীবন যাপন করতে হয়। এজন্যই তার জাহেরী ও বাতেনী সর্বপ্রকার শক্তি সঞ্চয় করার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন واعتصموا بحبل الله جميعا ولاتفرقواআল্লাহর রজ্জুকে সংঘবদ্ধভাবে আকড়িয়ে ধর এবং তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ো না। বিশ্বনবী হযরত রাসুলুল্লাহ (স.) মুসলমানদেরকে হামেশা দীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে জীবন যাপন করার জন্য বিশেষভাবে তাম্বীহ ও তাকীদ করে গেছেন। শুধু তাই না, দীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ ও দলবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপন করা যাতে আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তজ্জন্য পাঞ্জেগানা নামাজ, জুমা, ঈদ ও হজ্ব প্রভৃতি ইসলামের প্রধান প্রধান রোকনে জামায়াতকে অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছে। রাসুলে কারীম (স.) এরশাদ করেছেন, কোনো তিন ব্যক্তি কোনো স্থানে অবস্থান করলে তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নির্ধারণ করে জামায়াত কায়েম করতে হবে। এ হাদীস দ্বারা আরও সহজেই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। দীনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ না হয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খলাভাবে জীবন যাপন করলে তার পরিণাম কি হবে তৎ-সম্পর্কে কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তায়ালা ঘোষণা করেন فتذهب ريحكم তোমরা বিচ্ছিন্ন হলে তোমাদের শক্তি ও সামর্থ বিনষ্ট হয়ে যাবে।[২৮৭]

---

২৮৬ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

২৮৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদীর দৃষ্টিতে ইসলাহে হুকুমতের জন্য আন্দোলন

আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে বান্দার ওপর অর্পিত অপরিহার্য পালনীয় দায়িত্ব কর্তব্য সমূহের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন অন্যতম। আল্লাহ তায়ালার প্রকৃত বান্দাহ হওয়ার জন্য পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া আবশ্যক। আর ইসলামী সমাজ ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়া কোনোভাবেই সম্ভব নয়। এ জন্য ইসলামী আন্দোলনের মাধ্যমে ইকামতে দীনের বড়ো ফরজটি আদায় করলে অন্যান্য ফরজ আদায় করা বান্দার জন্য সহজ হয়ে যায়। কায়েদ সাহেব হুজুর বলেন- "ইসলাহে হুকুমতের জন্য তিন প্রকারের আন্দোলন করা যেতে পারে।

১ম প্রকার: সন্ত্রাসবাদের ভিত্তিতে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন।

২য় প্রকার: ক্ষমতা দখলের নিমিত্ত গণতন্ত্রের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

৩য় প্রকার: ইসলাহে হুকুমতের জন্য তাবলীগী পদ্ধতিতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন।

প্রথম প্রকারের আন্দোলন যা অবশ্য বর্জনীয়। কেননা-

প্রথমত: শরীয়তের দৃষ্টিতে মুসলিম রাষ্ট্রে এ ধরনের আন্দোলন অবৈধ।

দ্বিতীয়ত: এ ধরনের আন্দোলনের ফলে দেশের সামরিক অভ্যুত্থান, রক্তাক্ত বিপ্লব অথবা গৃহযুদ্ধ ঘটে এবং বিরাট জনশক্তি বিনষ্ট ও বহু জাতীয় সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

তৃতীয়ত: এ ধরনের আন্দোলনের ফলে দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙ্গে তার স্থলে মারাত্মক ধরনের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা থাকে।

চতুর্থত: এর ফলে দেশের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাওয়ায় দুর্নীতিবাজ দুষ্কৃতিকারী ও সমাজ বিরোধীদের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ফলে দেশের সর্বত্র অশান্তির আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে।

পঞ্চমত: এর ফলে দেশের অখণ্ডতা, ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট হয়ে দেশ অসৎ কোন শত্রু রাষ্ট্রের অনুগৃহীত ও তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে। প্রথম পদ্ধতি বর্জনীয় হওয়া সম্পর্কে যে পাঁচটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, আশা করি ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এ ব্যাপারে একমত হবেন।[২৮৮]

---

২৮৮ ইসলাম ও রাজনীতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

মৃত্যুর পর প্রতিনিধি নির্ধারণ সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান বা খলিফা তিনটি পদ্ধতির কোনো একটির মাধ্যমে এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন।

এক: আহলে হিল্ল ও আকদ এর পক্ষ থেকে মনোনীত বা নির্বাচিত হয়ে। উদাহরণত: আবু বকর (রা.) এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত আহলে হিল্ল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর সমস্ত সাহাবী তাঁর খিলাফতের পক্ষে ঐক্যমত পোষণ করেন, তাঁর হাতে বায়াত করেন এবং তাঁর খিলাফতের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

অনুরূপভাবে উসমান বিন আফফান (রা.) এর খিলাফতও এভাবে সাব্যস্ত হয়েছিল। উমর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলিফা নির্ধারণ করার জন্য শীর্ষস্থানীয় ছয়জন সাহাবীর সমন্বয়ে একটি পরামর্শসভা গঠন করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে আব্দুর রহমান বিন আওফ মুহাজির ও আনসারদের সাথে পরামর্শ করলেন। যখন দেখলেন যে, লোকেরা উসমান (রা.) কে চাচ্ছে তখন তিনিই প্রথম তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর ছয়জনের অবশিষ্ট সাহাবীগণও তাঁর হাতে বায়াত করেন। এরপর মুহাজির ও আনসারগণ তাঁর হাতে বায়াত করেন। এভাবে আহলে হিল্ল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

অনুরূপভাবে আলী (রা.) এর মনোনয়ন ও নির্বাচনও অধিকাংশ আহলে হিল্ল ও আকদ এর মনোনয়ন ও নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল।

দুই: পূর্ববর্তী খলিফার দেয়া প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া। অর্থাৎ পূর্ববর্তী খলিফা সুনির্দিষ্টভাবে কাউকে তাঁর পরবর্তী খলিফা হিসেবে প্রতিশ্রুতি দিবেন। এর উদাহরণ হচ্ছে-উমর (রা.) এর খিলাফত। তাঁর খিলাফত আবু বকর (রা.) এর দেয়া প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছিল।

তিন: শক্তি ও আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে। অর্থাৎ কেউ যদি তার অস্ত্র ও ক্ষমতা বলে তাকে মেনে নিতে মানুষকে বাধ্য করে এবং স্থিতিশীলতা আনতে সক্ষম হন সেক্ষেত্রে তার আনুগত্য করা অপরিহার্য, তিনি মুসলমানদের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে স্বীকৃতি পাবেন। উদাহরণত: কিছু কিছু উমাইয়া খলিফা ও আব্বাসী খলিফা এবং তাদের পরবর্তীতে কিছু কিছু খলিফা এভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছিলেন। এটি শরিয়ত বিরোধী, বেআইনী পদ্ধতি। কারণ অন্যায়ভাবে, জোরজবরদস্তিকরে ক্ষমতা দখল করা হয়েছে। তবে উম্মতের একজন শাসক থাকুক সে মহান কল্যাণের দিক এবং দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার মত সাংঘাতিক অকল্যাণের দিক

বিবেচনা করে জোরপূর্বক ও অস্ত্রবলে ক্ষমতা গ্রহণকারী আল্লাহর দেয়া শরিয়ত অনুযায়ী শাসন করলে তার আনুগত্য করতে হবে।

ইসলামী শরীয়তে খিলাফত নীতি কেমন হবে এবং এ বিষয়ে তার মতামত নিতে গিয়ে বলেন- "আমার অবর্তমানে নেছারাবাদের প্রতিষ্ঠান সমূহ মুরব্বী হিসেবে কে অথবা কারা পরিচালনা করবেন? এই প্রশ্নের জবাবে আমি আরজ করছি যে, হযরত (স.) তার ইন্তিকালের পূর্বে প্রকাশ্যভাবে তিনি কোনো খলিফা নিযুক্ত করে যাননি বরং খলিফা নির্বাচনের ভার সর্ব সাধারণ মুমিনদের শুরার উপর ন্যস্ত রেখে গেছেন। পক্ষান্তরে হযরত ছিদ্দীক আকবর (রা.) মৃত্যুর প্রাক্কালে হযরত ওমর (রা.) কে খলিফা মনোনীত করে গিয়েছেন। খলিফা নির্ধারণের ব্যাপারে উপরি বর্ণিত উভয় তরিকা অবলম্বন করা জায়েজ এতে সন্দেহ নেই। তবে আমি এ ব্যাপারে হযরত (স.) এর তরীকা অবলম্বনের পক্ষপাতি। তাই আমি আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করতে চাই না। বরং আমি আমার পীর ভাই মোহেব্বীগণকে অছিয়ত করছি, তারা যেন শুরার ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা যোগ্যতাসম্পন্ন ও মোখলেছ এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এই মহান খেদমতের জন্য নির্ধারিত করেন"।[২৮৯]

২৮৯ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

অষ্টম পরিচ্ছেদ
নিসবাতের মূল্য সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) নসবী আওলাদের চেয়ে রুহানী আওলাদের গুরুত্ব বেশি দিতেন, তিনি বলেন-"নসবী আওলাদের চাইতে রুহানী আওলাদের প্রাধান্য আমার কাছে বেশি।"[২৯০]

তিনি বলেন-"আমার ভক্তিভাজন পীর ভাইদের খেদমতে আরজ এই যে, আমাদের হামেশা মনে রাখা উচিত যে, আমরা গাওছে জামান কুতুবুল আকতাব ছারছীনা শরীফের হযরত পীর সাহেব কেবলার খাদেম শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত। এই নেছবতকে নাজাতের মস্তবড়ো অছীলা মনে করে জীবনভর তার হক আদায় করতে প্রাণপণ কোশেশ করা এবং আল্লাহপাকের নিকট মদদ তলব করা একান্ত আবশ্যক। মরহুম পীর সাহেব কেবলার নছীহত ও ওসিয়্যত সমূহকে গলার তাবিজ বানিয়ে রাখা এবং তদানুযায়ী জীবন গঠনের নিমিত্ত ছয় সংকল্প করা আমাদের প্রতি অবশ্য কর্তব্য। এতে অবহেলা করলে হয়তো কিয়ামতে আমাদের ভীষণ ভাবে লজ্জিত হতে হবে"।[২৯১]

আবেগ ও বিবেক সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

আবেগ ও বিবেক উভয়ই এক ধরনের প্রত্যক্ষ ও গভীর একান্ত অনুভুতি। আবেগ আমাদেরকে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু করার জন্য বলেনা। কিন্তু বিবেক তা বলে। তাহলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ালো, আমাদের যে ধরনের একান্ত ব্যক্তিগত গভীর অনুভূতি, করণীয় বা কর্তব্য সম্পর্কে কিছু বলেনা, যা শুধুই অনুভবের ব্যাপার, তা হলো আবেগ। পক্ষান্তরে আমাদের যেসব স্বজ্ঞাত, প্রত্যক্ষ ও গভীরতম বোধ আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট পন্থায় সুনির্দিষ্ট কিছু কর্মেও জন্য আমাদেরকে আমাদের অস্তিত্বের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ করে তা হলো বিবেক।

একই জিনিসের তলার দিকটা আবেগ। উপরের দিকটা বিবেক। অথচ মনে হয় যেন এ দুটি আলাদা জিনিস। না, আবেগ ও বিবেকের সম্পর্ক বিপরীত নয়। বরং নেসেসারি। এগুলো মিউচুয়্যালি এক্সক্লুসিভ নয়। মানে, একটা আরেকটাকে নাকচ করেনা। বরং আবেগ ও বিবেকের কোন একটি না থাকলে অপরটিও থাকবেনা। আবেগ হলো আমাদেও অস্তিত্বের,

---

২৯০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯

২৯১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

সত্তার ও চেতনার একেবারে গোড়ার বিষয়। আর বিবেক হলো আমাদের এই ভাষাতীত আবেগ ও বোধের শুদ্ধতম বহিঃপ্রকাশ।

নেছারাবাদী (রহ.) আবেগ ও বিবেককে সমানভাবে গুরুত্ব দিতেন। তিনি বলেন- "আমি একটু আবেগ-প্রবণ লোক। আবেগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দৈহিক শক্তি দ্বারা আমি কোন কাজ করতে পারি না। ইশকের বহিঃপ্রকাশ জযবাহ বা আবেগ। আর আকলের বহিঃপ্রকাশ ফিকহ বা চিন্তা। হাকিমূল উম্মত মাওলানা রুমী (রহ.) তো আকল এর উপর ইশককে প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে নয়। আমার মতে উৎস শক্তি সমভাবে জরুরি। উৎস শক্তির ইমতিয়াজের উপর ঈমানী শক্তি সৃষ্টি ও বৃদ্ধি নির্ভরশীল"।[২৯২]

শক্তিহীন আদর্শ, আদর্শহীন শক্তি: কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) শক্তিহীন আদর্শ অথবা এক তরফা আদর্শহীন শক্তিকে ভয়ংকর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

তিনি বলেন- "শক্তিহীন আদর্শ কোনোদিন বাস্তবায়িত হয় না। আবার আদর্শহীন শক্তি কখনও স্থায়ী হয় না। আদর্শহীন শক্তির অবস্থা হয় হালাকু খান চেঙ্গিস খান প্রমুখের সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির মত"।[২৯৩]

মওত সম্পর্কে নেছারাবাদীর চিন্তাধারা

প্রত্যেক প্রাণীকে মরতে হবে। ছারপোঁকা থেকে শুরু করে প্রাণওয়ালা যত সৃস্টিজীব আছে সবাইকে মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ইন্তেকালের কবল থেকে জগতের কোনো তাবৎ পরাশক্তি, কোনো প্রযুক্তি কাউকে বাঁচাতে পারবেনা। এখানে সবাই অক্ষম। মৃত্যুর নির্ধারিত সময় থেকে এক সেকেন্ড কমবেশি করার ক্ষমতা রাখেনা জগতের কোনো দাপটশালী মোড়ল। মৃত্যুা অনিবার্য স্বাদ সকল প্রাণীকে পান করতে হবে। আল্লাহ বলেন,"প্রত্যেক প্রাণীকে আস্বাদন করতে হবে মৃত্যু"। সূরা আনআম:১৮৫।

নেছারাবাদী (রহ.) মনে করতেন মুমিন কখনও মৃত্যুকে ভয় করে না, কারণ আশেক সব সময় মাশুকের কাছে যাওয়ার জন্যই আগ্রহী থাকে। তিনি বলেন-"মওতের ভয়ে ভীত ও চিন্তিত হওয়াকে আমি আদৌ পছন্দ করি না। কেননা আমার মতে মওতের ভয়ে ভীত ও চিন্তিত হওয়া খাঁটি মুসলমানের শান নয়।

আশিক সে যত অপরাধী ও বেয়াদব হোক না কেন সে কখনও তার মাশুকের দরবারে হাজির হওয়াকে না পছন্দ করতে পারে না তাই আমিও না পছন্দ করি না।[২৯৪]

---

২৯২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২৯৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

পঞ্চম অধ্যায়
কারামত ও দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ
নেছারাবাদী (রহ.)-এর কারামত

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে, কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন– অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত সত্য। আল্লাহর ওলিদের হাতে আলৌকিক কর্মকাণ্ড ঘটতে পারে এবং আল্লাহর ইচ্ছায় অতি প্রাকৃতি কিছু তাদের মাধ্যমে হতে পারে। পবিত্র কুরআন এবংহাদীসে ওলিদের কারামতের বিবরণ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছে যারা লোক চক্ষুর অন্তরালেই থাকতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার সেই বন্ধুকে বিভিন্ন কারামত[২৯৫] দ্বারা মানব সমাজে পরিচিত করে দেন।

হযরত কায়েদ সাহেব (রহ.) এর জীবনে বহু কারামত প্রকাশ পেয়েছে। তার কারামত প্রকাশ হোক বা কেউ এগুলো বলুক তা হুজুর মোটেও পছন্দ করতেন না এবং হুজুরের সামনে হুজুরের কারামতের কথা কেউ বললে তিনি তা বারণ করতেন এবং কারামতের বিষয়টি অন্যদিকে

---

২৯৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

২৯৫ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দাদের বৈশিষ্ট্যের অন্যতম নিদর্শন মোজেজা ও কারামত। মোজেজা প্রকাশ পায় নবী ও রাসুলদের মাধ্যমে আর কারামত হক্কানি আউলিয়ায়ে কেরামদের জন্য নির্ধারিত। কারামত (كرامة) শব্দটি আরবি একবচন। বহুবচনে كرامات। এর অর্থ বিশেষ ক্ষমতা, মর্যাদা ও সম্মান ইত্যাদি। ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে কারামত হলো-

أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح.

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর পছন্দনীয় বান্দাদের থেকে এমন কিছু কাজ প্রকাশ করেন, যা দ্বারা তিনি তাদের সম্মানিত করেন, যা অস্বাভাবিক ও অলৌকিক। নবী-রাসুলদের পরই এই বান্দাদের মর্যাদা যাদের ওলি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা এরশাদ করেছেন, জেনে রাখ, নিশ্চয় যারা আল্লাহর ওলি তাদের নেই কোনো ভয় এবং নেই কোনো চিন্তা। (সূরা ইউনুস : ৬২)। আহলে সুন্নাতওয়াল জামাতের আকিদা হচ্ছে,কারামাতুল আউলিয়ায়ে হাক্কুন–অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরামদের কারামত সত্য। এগুলো তাদের উচ্চ কামালাত তথামর্যাদার সাক্ষ্য বহন করে বটে; কিন্তু কখনও তারা এসবের মাধ্যমে নিজেদের জনসমাজে প্রকাশ করেন না। ওলিদের যে কারামত সংঘটিত হয়, এগুলো তাদের অনিচ্ছায় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় অলৌকিকভাবে সম্পন্ন হয়। ঘটনাচক্রে বা ক্ষেত্রবিশেষে ওলিদের মাধ্যমে কারামত প্রকাশ পায়। প্রকৃতপক্ষে যিনি আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা অর্থাৎ যারা আল্লাহর ওলি তাদের কারামত আল্লাহ পাকের জাত, সিফাত ও এলমে মারফতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। যে ব্যক্তি শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী কেবল তার দ্বারা কোনো অলৌকিক ঘটনা ঘটলেই এটিকে কারামত বলা হয়। যে ব্যক্তি আমলের ক্ষেত্রে শরিয়তের খেলাপ করে সে যদি চেষ্টা-সাধনা করে কোনোরূপ অলৌকিক কাজ প্রদর্শন করে তবে সেটি কারামত বলে গণ্য হবে না। তাই জাদুকর, কাফের বা যোগী-সন্ন্যাসীদের দ্বারা যে অস্বাভাবিক কাজ প্রদর্শিত হয় সেগুলো কখনও কারামত নয়। এসবকে এসতেদরাজ বলে। ওলি থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়া জায়েজ ও স্বাভাবিক। এটি সহিহ দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত। প্রকৃত মুসলমান একে অস্বীকার করতে পারে না।

নিয়ে যেতেন। নেছারাবাদী (রহ.) এর অসংখ্য কারামতের মধ্যে কয়েকটি কারামত উল্লেখ করা হল।

১. পক্ষাঘাতগ্রস্থের সুস্থতা: নেছারাবাদ মাদ্রাসার সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আলহাজ মাও. আবু জাফর মুহাম্মদ ছালেহ চাঁদপুরী সাহেব বর্ণনা করেন যে, আমি একবার নেছারাবাদের পক্ষ হতে কুয়েতে সফরে গিয়েছিলাম। কুয়েতে অবস্থানরত বিশিষ্ট দানবীর চান ভাই আমাকে নিয়ে গেলেন কুয়েতের এক শায়খের বাসভবনে। যিনি এক সময় বাংলাদেশে কুয়েতী রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সেখানে বসে চান ভাই তার জীবনের এক বিশেষ অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করেছিলেন- ১৯৯৪ইং সনে দেশে গিয়ে আমি একবার কায়েদ সাহেব হুজুরের কাছে দোয়া নিতে গেলাম। সময় তখন সকাল ১০টা, দর্শনার্থীদের প্রচণ্ড ভীড়। এমন সময় দেখলাম, পক্ষাঘাতে আক্রান্ত, চিকিৎসায় বিফল এক ব্যক্তি হুজুর (রহ.)-এর কাছে দোয়ার জন্য এসেছেন। তার কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। হুজুর কেবলার তখন জযবার হালত। তিনি অসুস্থ লোকটিকে দশফান্ডে[২৯৬] মান্নত করতে বললেন এবং অবশ হাতে কলম দিয়ে লিখতে নির্দেশ দিলেন। সে লিখতে পারছিল না। এবার হুজুর লাঠি হাতে সজোরে হাঁক দিয়ে বললেন, 'লিখ!' আল্লাহর কী অসীম রহমত, সে লিখতে সক্ষম হল। পক্ষাঘাতগ্রস্থ হাতে লোকটি লিখে চলল অবিরাম। তার অবশ হাত মুহূর্তে সুস্থ হয়ে গেল।[২৯৭] বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমরা সবাই।' প্রবাসী চান ভাই বললেন, 'হুজুরের দোয়ায় পক্ষাঘাত, ক্যান্সারসহ বিভিন্ন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত বহু রোগী সুস্থ হওয়ার ঘটনা পূর্ব থেকেই আমি শুনে আসছিলাম।'

২. মাথা ব্যথা এবং অপারেশন থেকে মুক্তি: ঝালকাঠি জেলার বাজার নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বগুড়া নিবাসী জনাব আবু রায়হান আলী হুজুরের ইন্তিকালের পর নেছারাবাদ জামে মসজিদে উপস্থিত হয়ে এক জলসায় নিম্নের ঘটনাটি নিজ মুখে এভাবে বর্ণনা করেছিলেন: 'কায়েদ সাহেব হুজুরের

---

২৯৬ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)-এর জীবন্ত কারামাত দশফান্ড। বিপদ-আপদ হতে মুক্তি লাভ ও নেক মাকছুদ হাছিলের জন্য হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) প্রতিষ্ঠিত দশফান্ডে আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করা একটি মাক্ববুল পদ্ধতি। বিপদ গ্রস্থ ও রোগ গ্রস্থ অসহায় মানুষের মুক্তি ও নেক মাকসুদ হাসিলের জন্য আল্লাহ তায়ালার রহমত লাভের অব্যর্থ ওসীলা হিসেবে হুজুর (রহ.) প্রতিষ্ঠা করে গেছেন দশফান্ড। আজও তাই হুজুর (রহ.) এর লেখা পড়ে মানুষ পায় পথের দিশা। তারই প্রতিষ্ঠিত দশফান্ডে আল্লাহর ওয়াস্তে মান্নত করে বিপদ আপদ বালা মুসিবত থেকে মানুষ পায় মুক্তি, পূর্ণ হয় তাদের নেক আশা। সেই খানকা দশফান্ড বিশাল কমপ্লেক্স সবকিছুই আজও আছে। দশফান্ডের ফান্ড সমূহ: ১)মসজিদ ২)লিল্লাহ্ বোর্ডিং ৩)এতিম খানা ৪)আলিয়া মাদ্রাসা ৫)হাফেজিয়া মাদ্রাসা ৬) কমপ্লেক্স ৭)মুছলেহীন ৮)এমদাদ ফান্ড ৯)মাহফিল ১০)মহিলা মাদ্রাসা।

২৯৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫২

ইন্তেকালের কিছুদিন আগে ঝালকাঠি জেলার কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তার সাথে আমি নেছারাবাদে মাহফিলের আখেরী মুনাজাতে শামিল হয়েছিলাম। মুনাজাত শেষে দেখলাম সবাই দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে হুজুরের দোয়া নিচ্ছে। আমার দীর্ঘদিনের মাথা ব্যথা ছিল, আমিও হুজুরের দোয়া নেয়ার জন্য লাইনে দাঁড়ালাম এবং হুজুরের ফুঁ নিলাম। আশ্চর্য হয়ে গেলাম! প্রায় ২০ বছর ধরে যে মাথা ব্যথা বহু চিকিৎসার পরেও ভালো হচ্ছিল না, হুজুর (রহ.)-এর ফুঁ নেয়ার পর তা থেকে সম্পূর্ণ আরোগ্য হওয়ায় আমি তার প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছিলাম। ভেবেছিলাম বাবাকেও হুজুরের কাছে নিয়ে আসব। তিনি খুবই অসুস্থ, গলায় দুটি টিউমার, ডাক্তার বলেছে দ্রুত অপারেশন করতে হবে। কিন্তু ইতোমধ্যে হুজুর ইন্তেকাল করায় আমি মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়লাম। কেবল ভাবতে লাগলাম, হুজুর নেই, এখন উপায় কী! এ পর্যায়ে একদিন দশফান্ডে মান্নত করলাম আর আক্ষেপে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। সেই রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম, কায়েদ সাহেব হুজুর মরুভূমির মধ্যে একটি জাঁকজমকপূর্ণ বিমানে করে অবতরণ করলেন। বহু লোক তার সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। আমার বাবার সমস্যাটির কথা বলার জন্য আমিও সেখানে উপস্থিত হয়েছি, হুজুর আমাকে দেখে কাছে ডাকলেন, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'চিন্তা করো না, আমি দোয়া করি, তোমার বাবার অপারেশন লাগবে না', আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নের কথা পরিবারের সকলকে বলার পর আব্বা বললেন-'সব স্বপ্নই কি সত্য হয়?' অবশেষে ২৩ মে ২০০৮ রাত ৮টায় বাবাকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়া হলো। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থেকে আমি অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। অপারেশনের জন্য নির্ধারিত ডাক্তার আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন- 'আপনার বাবাকে ওটিতে আনার পরেও, এমন কি দাঁড়ি শেভের সময়ও টিউমার দুটি বিদ্যমান ছিল, অথচ অপারেশন প্রাক্কালে টিউমার পাচ্ছি না।' বিস্ময়ে হতবাক! কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) আমাকে স্বপ্নে এ কথাই বলেছিলেন। হুজুর (রহ.) এর ইন্তেকালের পর থেকে এভাবে একের পর এক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছি।[২৯৮]

৩. কবরবাসীর মেহমানদারী: হুজুর একদিন তার জামাতা মাওলানা আব্দুস সাদেক সাহেবকে বললেন, চলেন এক আল্লাহর ওলীর মাযার জিয়ারত করে আসি। তিনি ছিলেন নেছারাবাদ মাদ্রাসার লিল্লাহ বোর্ডিং এর বাবুর্চি, লিল্লাহ বোর্ডিং-এ পাক করতেন এবং হুজুরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতেন। তার আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা কেউই জানত না। হুজুর তার জামাতা মাওলানা আব্দুস সাদেক এবং অন্যান্য সফরসঙ্গী নিয়ে চলে গেলেন তার কবর জিয়ারতে।

---

২৯৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

জিয়ারত শেষে সকলকে লক্ষ করে বললেন- 'আজ যদি বাবুর্চি সাহেব বেঁচে থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের মেহমানদারি করাতেন।' হুজুরের একথা বলার সাথে সাথে বাবুর্চি সাহেবের কবর-ঘেঁষা নারিকেল গাছের চার-পাঁচটি ডাব থেকে পানি পড়া শুরু করল। হুজুর সকলকে লক্ষ করে বললেন- প্রাণ ভরে সকলে পানি পান কর। এটা আল্লাহর ওলীর মেহমানদারী।[২৯৯]

৪. মুখের থুথুতে পঁচন রোধঃ ঝালকাঠি সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার শাহ আলম সাহেব হুজুরের একটি কারামত বর্ণনা করে বলেছেন, '১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের কথা। হাসপাতালে ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছিল। একদিন হাসপাতালে গিয়ে দেখি একটা রোগী তার পায়ে পঁচন ধরায় হাসপাতালের বারান্দায় ব্যথায় কাঁতরাচ্ছে। ডাক্তারদের ধর্মঘট থাকায় কেউ লোকটির চিকিৎসা করছে না। আমার খুব মায়া হল, কিন্তু ধর্মঘট চলায় অন্যদেরকে উপেক্ষা করে রোগীটির চিকিৎসা করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। আমি রোগীর কাছে গিয়ে তার পঁচন ধরা পায়ে একটু সেভলন মেখে দিয়ে বললাম, আপনি বরিশাল হাসপাতালে গিয়ে ভর্তি হন। এখানে ধর্মঘট চলায় আপনার চিকিৎসা করা সম্ভব হবে না। বৃদ্ধ অসহায় লোকটি কোনো মতে হাসপাতাল ত্যাগ করল, লোকটির পায়ের পঁচনের অবস্থা এমন ছিল যে, আমি ভালো করেই বুঝেছিলাম তার এ পা এদেশের চিকিৎসায় কখনই ভালো হবে না। কয়েক মাস পরের ঘটনা। আমি আমার ঝালকাঠি শহরের বাসায় চেয়ারে বসা, দেখি সেই লোকটি পুরোপুরি সুস্থ অবস্থায় আমার চেয়ারের সামনে হাঁটাহাঁটি করছে। আমি লোকটাকে কাছে ডাকলাম, আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার এ পায়ের চিকিৎসা কোথায় করেছ? লোকটি জবাবে বলল, আমাদের মতো গরীবেরা আর কোথায় চিকিৎসা করাবে! আপনারা যখন আমাকে হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তখন আমি সোজা কায়েদ সাহেব হুজুরের বাড়িতে চলে এলাম। হুজুর আমার এ অবস্থা দেখে তার মুখের একটু পানের রস ও থুথু আমার পচন ধরা পায়ে লাগিয়ে দিলেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে কোনো ঔষধ ছাড়াই অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে গেলাম।[৩০০]

৫. হুজুরের মোরব্বা খেতে চাওয়াঃ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জযবা অবস্থায় একবার খুব ভোরে ঝালকাঠির বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজ সেবক জনাব সরদার শাহ আলম সাহেবের বাসায় গিয়ে হাজির হন। সরদার শাহ আলম সাহেব হুজুরকে আদবের সাথে বসতে দিয়ে

---

২৯৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৩০০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

জিজ্ঞেস করলেন, 'হুজুর, আপনাকে কি খাওয়াব?' হুজুর জওয়াবে বললেন— 'মোরব্বা খাব।' শাহ আলম সাহেব অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়লেন। এত ভোরে কোথায় পাবেন মোরব্বা! হুজুরের প্রিয় খাবার জোগাড় করতে পারবেন না মনে করে তিনি খুবই মর্মাহত হলেন। শাহ আলম সাহেবের স্ত্রী স্বামীর পেরেশানী দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,'কি হয়েছে?' সরদার সাহেব স্ত্রীকে এ ঘটনা বললে, স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে হাসিমুখে জানালেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, গতরাতে আমার বোনবাড়ি থেকে মোরব্বা পাঠিয়েছে যা আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছি।' স্ত্রীর কথা শুনে সরদার সাহেব তো একেবারেই থ! তিনি সাথে-সাথে হুজুরকে সে মোরব্বা নিয়ে খেতে দিলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন- 'হুজুর কি ভাবে বুঝতে পারলেন আমার ঘরে মোরব্বা আছে!'[৩০১]

৬. হাল ছেড়ে দেয়া ডুবন্ত জাহাজের ভেসে ওঠা: ঢাকার বিশিষ্ট কার্গো ব্যবসায়ী জনাব নান্নু মিয়া হুজুর কেবলার কারামতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন- ষোল কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার সিমেন্ট ক্লিংকার নিয়ে ২০০৬ সনে আমার তৃষা-১ জাহাজটি ঝালকাঠির গাবখান নদীতে ডুবে যায়। প্রায় দেড় বছর সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়েও জাহাজটি তুলতে না পেরে এবং জাহাজটি তুলতে গিয়ে হতাহতের ঘটনাসহ লাখ-লাখ টাকা খেসারত দিয়ে আমি হতাশ ও বিমর্ষ অবস্থায় হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)-এর কাছে যাই। হুজুর (রহ.) আমাকে দশফাণ্ডে মান্নত ও ধৈর্য ধারণ করতে বললেন। এক পর্যায়ে জাহাজটি আর ফিরে পাব না ভেবে সর্বস্ব হারিয়ে দেশ ত্যাগ ও নিরুদ্দেশ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য এক রাতে হুজুর (রহ.)-এর কাছে গেলাম। হুজুর (রহ.) আমাকে বিদায় না দিয়ে নদীর তীরে জাহাজের কাছে যেতে বললেন। তখন গভীর রাত, আমি নদীর তীরে পৌঁছে আবেগাপ্লুত হয়ে কাঁদতে ছিলাম, হঠাৎ দেখি নদীর পানি শুকিয়ে গিয়ে পরক্ষণেই নদীটি পানিতে পূর্ণ হয়ে গেছে এবং আমার ডুবে যাওয়া জাহাজটি পানির উপর ভাসছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিনিয়ত হুজুরের (রহ.)-এর কাছে মানুষেরা কেন ভীড় করতেন তা অবাক চিত্তে আমি নিজেই সেদিন অবলোকন করেছি।[৩০২]

৭. ছেড়ে যাওয়া লঞ্চের ফিরে আসা: কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার খাদেম জনাব মৌলভী মুহাম্মদ সুলায়মান বর্ণনা করেন, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে হুজুর কেবলা একবার শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক সাহেবের বাড়ি থেকে হেঁটে দোয়ারিকা লঞ্চঘাটে এলেন। হুজুর সেখানে এসে ঘাটে লঞ্চ বাঁধা দেখে লঞ্চের চালককে একটু অপেক্ষা করতে বললেন। কিন্তু চালক হুজুরের

---

৩০১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪

৩০২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

অপেক্ষা না করেই লঞ্চটি ছেড়ে দিল। হুজুর কিছুক্ষণ পর এসে লঞ্চটি ঘাটে না দেখে আর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল লঞ্চটি স্বেচ্ছায় এসে দোয়ারিকা ঘাটে ভিড়ল। হুজুর তার সফরসঙ্গীসহ লঞ্চে উঠলেন। মনে হচ্ছিল যেন হুজুর লঞ্চটি আসার অপেক্ষায়ই ছিলেন। লঞ্চের করণিক হুজুর কেবলার সফরসঙ্গী জনাব হেকীম আব্দুল আজীজ সিরাজী সাহেবের কাছে হুজুর সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল। সিরাজী সাহেব হুজুর কেবলার পরিচয় দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা তো লঞ্চ নিয়ে চলে গিয়েছিলেন, কি মনে করে আবার ফিরে এলেন?' করণিক বলল, 'আমরা লঞ্চ ছেড়ে যখন দু-এক মাইল দূরে চলে এলাম তখন চালক শত চেষ্টা করেও লঞ্চটিকে আর সামনের দিকে নিতে পারছিল না, লঞ্চটি বারবার পিছনের দিকে ঘুরে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে লঞ্চটির মেশিন বন্ধ হয়ে যায় এবং এই অবস্থায়ই স্রোতের উল্টা দিকে ভাসতে ভাসতে পুনরায় দোয়ারিকা ঘাটে চলে আসে। আমরা তখন বুঝতে পারলাম যে, ঐ হুজুরের জন্য অপেক্ষা না করায় হয়তো ঐ ঘটনা ঘটেছে। হুজুর লঞ্চে উঠে লঞ্চ স্ট্যার্ট করতে বললেন। কিছুক্ষণ পূর্বে লঞ্চের যে মেশিনটি কোনোক্রমেই স্টার্ট হচ্ছিল না, হুজুরের বলার পর বন্ধ হওয়া মেশিন স্টার্ট করা মাত্রই তা চালু হয়ে যায়।[৩০৩]

৮. ডাকাতির মাল ফেরৎ ক্ষতিপূরণ ও ডাকাতদের তওবা: বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার নলশ্রী গ্রাম নিবাসী জনাব মেনহাজ উদ্দীন বালীর সন্তান বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মো: আব্দুর রাজ্জাক বালী ডাকাতির কবলে পড়ে সর্বস্ব হারানোর পর মাল এবং ক্ষতিপূরণ পাবার এক অবিস্মরণীয় ঘটনার কথা এভাবে বলেন- ১৯৯০ সনে পটুয়াখালীর মির্জাগঞ্জ উপজেলার আয়লা বাজার থেকে প্রায় আড়াইশ মন ধান কিনে আমার মহাজনী নৌকায় করে বানারীপাড়ার উদ্দেশ্যে রওনা হই। সন্ধ্যা ৭টার দিকে ঝালকাঠির দক্ষিণে হাইলাকাঠি নামক এলাকায় নৌ-দস্যুদের কবলে পড়ি। তারা প্রচণ্ড মারধর করে সঙ্গের টাকা-পয়সা, কাপড়-চোপড় কেড়ে নিয়ে আমাকে নদীতে ফেলে দেয় এবং সঙ্গীসাথীদেরকে বেঁধে নিয়ে যায়। আমি অনেক কষ্টে হাবুডুবু খেতে-খেতে নদীর তীরে আসি এবং রাত ৯টার দিকে ঝালকাঠি থানায় পৌঁছাই। থানা-পুলিশের সহযোগিতায় তাদের নৌযানে করে আমার নৌকা খোঁজার চেষ্টা করে বিফল হয়ে ফিরে আসি। আমার আহাজারী শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন। তাদের মুখেই সর্বপ্রথম আমি হযরত কায়েদ সাহেব হুজুরের নাম শুনি এবং তার দরবারে আসি। হুজুর আমার মুসীবতের কথা শুনে দশফান্ডে মান্নত করতে বললেন এবং ঘটনাস্থলের দক্ষিণ দিকে

---

৩০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

খুঁজতে বললেন। আমি সেই মুহূর্তে দশফান্ডে মান্নত করে বাড়িতে রওনা হই এবং লোকজন যোগাড় করে পরদিন ভোরবেলা ভাড়া করা ট্রলার নিয়ে হুজুরের নির্দেশ মত ঘটনাস্থলের দক্ষিণ দিকে খুঁজতে আরম্ভ করি, খুঁজতে খুঁজতে দুপুর গড়িয়ে গেলে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অতীষ্ঠ হয়ে আমরা ভবানীপুর নামক বাজারে এসে উপস্থিত হই। আমাদের হতশ্রী ও বিপন্ন অবস্থা দেখে এবং দুর্দশার কথা শুনে বাজারের লোকজন বলল, 'হুজুর যখন বলেছেন, আপনারা আরো খুঁজতে থাকুন, হুজুরের কথা বিফলে যেতে পারে না।' তো, আবার খোঁজা শুরু করলাম, ভবানীপুরের দক্ষিণ দিকে কিছুদূর যেতেই আমার নৌকাটিকে নদী-তীরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পাই এবং লোকমুখে শুনি, ডাকাতরা রাতেই ধান এবং নৌকার মেশিন ভাগাভাগি করে নিয়ে গেছে। পরে নলছিটি থানা পুলিশের সহযোগিতায় দেড়শ মন ধান উদ্ধার করি এবং ডাকাতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। এক পর্যায়ে অবস্থা বেগতিক দেখে অর্থাৎ কায়েদ সাহেব হুজুরের কাছে ডাকাতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এ সংবাদে ডাকাতদল ভীত হয়ে একদিন হুজুরের কাছে হাজির হয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ নগদ ৪০ হাজার টাকা তার হাতে দিয়ে জীবনে আর ডাকাতি না করার শপথ নেয় ও তওবা করে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ডাকাতি করতে নামে তারা, কায়েদ সাহেব হুজুরের হাতে হাত দেয়ার পরিণতি কী হতে পারে বুঝতে না পারায় যা ঘটার তাই ঘটেছে, সমূলে প্রাণ হারায় ডাকাত দল।[৩০৪]

হুজুরের জীবনে এ রকম একটি-দুটি ঘটনা নয়, হাজার-হাজার ঘটনা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। হুজুরের এসব ঘটনা লিখতে গেলে শুধু কারামতের জন্যই একটি বই রচনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহর ওলীদের এ সকল ঘটনা থেকে শিক্ষা নেয়ার তাওফীক দান করুন।

৯. মৃগী রোগীর আরোগ্য লাভ: বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধীকারী শিহাব ভাই দীর্ঘদিন আগে তিনি বাই বা মৃগী রোগের মত দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পরপর ২বার বেহুঁশ হয়েছিলেন। এমনকি নিজেকে নিয়ে তিনি পেরেশান হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় বাওনা বাজারে মেরাজ প্রেসের মালিকের পরামর্শে তিনি কায়েদ সাহেব (রহ.) এর দরাবারে গেলেন অত্র ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভের জন্য। কায়েদ (রহ.) তাঁকে ঠিক ঠাক ভাবে নামায আদায়ের উপদেশ দিয়ে স্বীয় প্রতিষ্ঠিত দশফান্ডে কিছু টাকা মান্নত করার পরামর্শ

৩০৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

দিলেন। আরোগ্য না হলে যে মান্নত পূর্ণ করতে হবে না। শিহাব ভাই নিজে বলেন ঐ দিন থেকে আজ পর্যন্ত ঐ ব্যাধি কোনদিন আমাকে আর স্পর্শ করেনি।[৩০৫]

১০. মিথ্যা বলার পরিণতিঃ ইশ্বরকাঠী, নলছিটি, ঝালকাঠির মোঃ জামাল বর্ণনায় জানান- ১৯৮০ সনের ঘটনা। এক রাতে আমার হালের গরু দুটি দুর্বৃত্তরা জবাই করে নদীর তীরে ফেলে রেখে যায়। ঘটনার সাথে কারা জড়িত তা উদঘাটনে এলাকার চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ব্যর্থ হয়ে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) কে বিষয়টি জানালে হুজুর (রহ.) দশফান্ডে মান্নত করতে বললে আমরা মান্নত করলাম এবং সন্দেহভাজনদের নিয়ে হুজুর (রহ.) এর দরবারে এলাম। উদ্দেশ্য সন্দেহভাজনরা হুজুর (রহ.) হাত ধরে বলবে তারা এঘটনার সাথে জড়িত নয়। কেননা জানে হুজুর (রহ.) এর সাথে বেয়াদবী করে, তার হাত ধরে মিথ্যা বলে পার পাওয়া যায় না। এতদসত্ত্বেও সেদিন হতভাগা আব্দুস সত্তার হুজুরের (রহ.) হাত ধরে নিজেকে নির্দোষ দাবী করল । রক্ষা আর পেল না। বাড়িতে পৌছতে না পৌঁছতেই সে পাগল হয়ে বলতে লাগল দেখছি দেখছি কইলামনা কেন? আজও সেই একই কথা বলে বেড়াচ্ছে এবং পাগল অবস্থায় পথে পথে ঘুরছে।[৩০৬]

---

৩০৫ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯-৪০

৩০৬ গবেষক ২২-০৭-২০১৯খ্রি. তারিখ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেছারাবাদী (রহ.) এর বড়ো মেয়ের বড়ো ছেলে মোঃ ছাইফুল হক ইছলাহীর কাছ থেকে উক্ত তথ্য সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)-এর দর্শন

১. মজলুম, সে মুসলমান হোক আর হিন্দু হোক, তাদের চোখের পানি আমার সহ্য হয় না; কোন মুমিনের সহ্য হতে পারে না।[৩০৭]

২. ওস্তাদ কাফের[৩০৮] অথবা ফাসেক[৩০৯] হইলেও যথাসাধ্য তাহার সম্মান ও ভক্তি করিবে এবং শক্তি অনুযায়ী খেদমত করিবে। কিন্তু তাহাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবে না। অনুকরণ ও অনুসরণের বেলায় একমাত্র নেককার ও পরহেযগার ওস্তাদের অনুকরণ ও অনুসরণ করিবে।[৩১০]

৩. মুসলমান হওয়ার জন্য মুমিনের আল্লাহওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া উচিত। আমার মতে, কোনো মুসলমান আল্লাহওয়ালা সমাজকেন্দ্রিক হওয়া ব্যতীত আল্লাহ পাকের ওলী হতে পারে না।[৩১১]

৪. দীন ইসলাম সিরাতে মুস্তাকীম[৩১২] অর্থাৎ মধ্যপন্থা। এতে ইফরাত অর্থাৎ চরম আদর্শবাদ এবং তাফরীত অর্থাৎ শিথিল মতবাদ-এর স্থান নেই; উভয়ই দীনের জন্যে ক্ষতিকারক।[৩১৩]

---

৩০৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

৩০৮ কাফির (كافر) শব্দটি কুফর (كفر) থেকে উৎকলিত। 'কুফর' শব্দের অর্থ হচ্ছে অস্বীকার করা, অবিশ্বাস করা অথবা গোপন করা। বাংলাতে 'কাফের' শব্দের অর্থ করা হয় অবিশ্বাসী। (الكافر هو الذي ينكر المنكر و الجاحد وجود الله عزّ وجلّ)

যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত দীন ইসলাম বা ইসলামের কোনো অংশকে, কুরানুল কারীম বা এর কোনো আয়াত, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা কোনো একজন নবী অথবা রাসুলকে অস্বীকার করে, ইসলামী আকিদাহ বা এর মৌলিক কোনো ধর্মীয় বিশ্বাস বা অকাট্য দলিল দিয়ে প্রমাণিত ইসলামের কোনো বিধি-বিধানকে অস্বীকার করে, অবিশ্বাস করে, প্রত্যাখ্যান অথবা এইগুলো নিয়ে হাসি-ঠাট্টা বা অবজ্ঞা করে, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি একজন কাফের। কাফের চির জাহান্নামী, সে কোনোদিন জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না। অনন্তকাল সে জাহান্নামে কঠিন শাস্তি পেতে থাকবে।

৩০৯ 'ফিসক (فسق) শব্দের অর্থ হচ্ছে অবাধ্যতা। বাংলাতে 'ফাসেক' শব্দের অর্থ করা হয় পাপীষ্ঠ। পরিভাষায়-

هو خروج الإنسان عن حدود الشرع وانتهاك قوانينه بالسيئات وارتكاب المحرمات

যে ব্যক্তি নিয়মিত কবীরাহ গুনাহতে লিপ্ত থাকে অথবা প্রকাশ্যে আল্লাহর নিষিদ্ধ ঘোষিত হারাম কাজ করতে অভ্যস্ত এবং তওবা করে পাপ কাজ থেকে ফিরে আসে না, তাকে ফাসেক বলা হয়।

৩১০ হাকীকতে ইলমে দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

৩১১ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৩১২ সিরাতাল মুস্তাকিম (الصراط المستقيم) হ আরবি শব্দ বা পদ যার অর্থ সরল পথ। ইসলামে, এটিকে সঠিক পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিভিন্ন মাধ্যমে এটিকে 'মধ্য পথ' হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে এবং এটি তা যা আল্লাহকে খুশি করে।

৩১৩ ইসলামী জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

৫. অনেকে মনে করে, জিহাদের অর্থ মারামারি, খুনাখুনি ও রক্তারক্তি। জিহাদের নাম শুনলেই তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যায়। অথচ জিহাদ ব্যতীত পার্থিব ও পরলৌকিক কোনো জিনিসই টিকে থাকতে পারে না। জিহাদের আভিধানিক অর্থ, উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত বার-বার চেষ্টা করা এবং শক্তি ব্যয় করা।[৩১৪]

৬. মুসলিম জীবনের একমাত্র লক্ষ হল আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি হাসিল করা।[৩১৫]

৭. আল্লাহর হক আল্লাহ পাকের মর্জী হলে মাফ করে দেবেন, কিন্তু বান্দার হক যে পর্যন্ত না তা হকদার মাফ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা তা মাফ করবেন না।[৩১৬]

৮. আল্লাহ তায়ালার প্রতিটি হুকুমের উপকারিতা আমাদের বুঝে না আসলেও আমাদের মনে করতে হবে যে, যেহেতু আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ, সর্বদ্রষ্টা এবং পরম করুণাময়, সুতরাং তার প্রতিটি হুকুমের মধ্যেই আমাদের জন্য ফায়দা নিহিত রয়েছে।[৩১৭]

৯. যারা রূহানিয়াতকে অস্বীকার করে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে। আল্লাহ তায়ালা এর থেকে আমাদের হেফাযত করুন।[৩১৮]

১০. মু'মিন কামেলের একটি নিদর্শন হইল এই যে, যে সকল ব্যক্তি ও বস্তুকে পার্থিব গরযে মহব্বত করা যায়, তাহারা তাহাদিগকে পার্থিব গরযে মহব্বত না করিয়া হুব্ব ফিল্লাহ ও হুব্ব লিল্লাহ (আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি) এর ভিত্তিতে মহব্বত করিবে।[৩১৯]

১১. পীর ভক্তি ওয়াজিব। কিন্তু শরীয়ত বর্জন করে পীরের আনুগত্য শিরক।[৩২০]

১২. আমার কাছে কোয়ালিটির (যোগ্যতার) মূল্য বেশি, কোয়ানটিটি (সংখ্যা)-এর মূল্য বেশি নয়। আমি কোয়ালিটিতে বিশ্বাসী, কোয়ানটিটিতে বিশ্বাসী নই।[৩২১]

১৩. ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। সুতরাং রাজনীতিও এর অবিচ্ছেদ্য অংশ।[৩২২]

১৪. যারা সকল কাজ আল্লাহর ওয়াস্তে করেন, তারা আল্লাহ তায়ালার গায়েবী সাহায্য লাভ

---

৩১৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭
৩১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯
৩১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
৩১৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮
৩১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
৩১৯ তামীরে আখলাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২
৩২০ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

করেন এবং ধারণাতীতভাবে পার্থিব উন্নতিও লাভ করে থাকেন।[৩২৩]

১৫. যে আদর্শ ও গুণের অধিকারী হলে মানুষ মুসলমান পরিচয়ধারী হতে পারে, সে আদর্শের নাম হল ইসলাম। সুতরাং যিনি ইসলামের আদর্শকে কবুল করেছেন, তিনি যে কোনো বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই মুসলমান।[৩২৪]

১৬. ইসলামী জিন্দেগীর কোনো কাজই দুনিয়ার নয়। কেননা ইবাদত-বন্দেগী, ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কারবার, রাজনীতি-সমাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি জীবনের যে কোনো কাজ ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি করা হয়, তাহলে তা দীনের অন্তর্ভুক্ত ও ইবাদতে পরিণত হয়।[৩২৫]

১৭. ইসলামের বিধান কতিপয় রীতি-নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এতে মানুষের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব-জীবনের প্রত্যেক স্তর খোদায়ী বিধান দ্বারা নির্মিত।[৩২৬]

১৮. ইসলামী জিন্দেগী ঐরূপ জীবনকে বলা হয় যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামের আদর্শ অনুযায়ী গঠিত এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের বিধান অনুযায়ী পরিচালিত।[৩২৭]

১৯. মহব্বতের চরম বিকাশকে বলা হয় ইশ্‌ক। মুমিনের ইশ্‌ক করিতে হইবে কেবলমাত্র আল্লাহ ও রাসুলের সঙ্গে। আল্লাহ ও রাসুল ব্যতীত কোন ব্যক্তি অথবা বস্তুর সহিত মুমিনের ইশ্‌ক হইতে পারে না।[৩২৮]

---

৩২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪
৩২৪ ইসলামী জিন্দেগী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৩২৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
৩২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩২৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯
৩২৮ তামীরে আখলাক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইন্তিকাল ও কাফন-দাফন

মানুষ মাত্রই চিরন্তন নিয়ম এ দুনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে। কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)ও এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। ইন্তিকাল ও জানাজার বিবরণ দিয়ে মাওলানা রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী লিখেছেন- 'আল্লাহ তা'য়ালার কী শান! আল্লাহ তা'য়ালা যা মঞ্জুর করেন তা কখনো খণ্ডন হবার নয়। ২৭ এপ্রিল থেকে হুজুর কেবলার অবস্থা খুবই খারাপের দিকে চলে গেল। হাসপাতালের মালিক বোর্ড গঠন করে হুজুর কেবলার চিকিৎসার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, হুজুরকে এখন আমাদের আই.সি.ইউতে নিতে হবে। কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে হুজুর কেবলার সাহেবজাদা রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তা'য়ালার যা ইচ্ছা তাই হবে। হুজুরকে আমাদের কাছ থেকে আড়ালে নিতে দেব না।' হুজুরের কাছে বসেই তাসবীহ-তাহলীল, দোয়া-দরূদ, কুরআন তিলোয়াত চলতে থাকল। সারা রাত এভাবে অতিবাহিত হল। হুজুর কেবলার ঢাকাস্থ ভক্তবৃন্দ হুজুরের কাছে বসে এক নজরে অশ্রুসিক্ত নয়নে হুজুর কেবলার চেহারার দিকে তাকিয়ে আছে। হুজুর কেবলার মানসপুত্র রুহুল আমীন খান বলেছেন, এ সময় হুজুর কেবলার মুখের কাছে কান নিয়ে শুনতে পেলাম, হুজুর আল্লাহ আল্লাহ যিকির করছেন। হুজুর কেবলার যবান থেকে শুধু একটি শব্দই বের হচ্ছে , আল্লাহ আল্লাহ।'

২৮ সালের ২৮ এপ্রিল সোমবার ৭.১৫ মিনিট। হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলা (রহ.) লাখ-কোটি ভক্ত, অনুরক্তকে শোক সাগরে ভাসিয়ে তার মাহবুবের মহান দরবারে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।[৩২৯]

নেছারাবাদী হুজুর আর নেই। শোকার্ত মানুষের ঢল নামল। কিভাবে সামাল দিবে হাসপাতালে। কফিন নিয়ে যাওয়া হল মহাখালীস্থ মসজিদে গাউসুল আজমে।[৩৩০] মুহূর্তের মধ্যে জমায়েত হলো এ দেশের পীর-মাশায়েখ, আলেম-ওলামা ও জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ অগণিত লোক। দ্রুত কাজ সমাপ্ত করে, কাফন পরিধান করিয়ে কফিনবাহী শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্স চলল ঝালকাঠির পানে। কোথাও কোন বিলম্ব না করে ফেরী পারাপারেও দেরী না

---

৩২৯ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর রহ. জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

৩৩০ ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের প্রদত্ত অর্থে মসজিদে গাউছুল আজম আবদুল কাদের জিলানি (রহ.) ও জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কমপ্লেক্স নির্মিত হয়। মসজিদের জন্য তৎকালীন প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদের সময় ৮.৫ একর জমি বরাদ্দ দেয়া হয়। এই মসজিদে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও পৃথকভাবে নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে।

করে মৃতদেহ নিয়ে এ্যাম্বুলেন্স চলল সোজা বরিশালের দিক। শহর অতিক্রম করতেই দৃশ্য পাল্টে গেল। রাস্তার দু'ধারে শোকার্ত মানুষ, তাদের কণ্ঠে কান্নার আওয়াজ। চোখে অশ্রুর ঢল। বরিশাল থেকে ঝালকাঠির সুদীর্ঘ পথে সর্বত্র একই দৃশ্য। ঝালকাঠিতে সব দোকানপাট ছিল বন্ধ। মুসলিম, হিন্দু, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই গাড়ির প্রতি হস্ত উত্তোলন করে জানাচ্ছে সালাম, শ্রদ্ধা।

এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হল নেছারাবাদ মাদ্রাসা কমপ্লেক্সে উপস্থিত হতেই। আত্মীয়-স্বজন, ছাত্র-শিক্ষক, ভক্ত-অনুরক্তদের সমাগমে ময়দান তখন পূর্ণ। অশ্রু সবার চোখে, কান্নার ধ্বনি সবার কণ্ঠে। সোমবার দিবাগত সারারাত গেল একটি বারের জন্য শেষ দেখা দেখতে। তবুও সবাইকে দেখান সম্ভব হল না। ২৯ এপ্রিল মঙ্গলবার বাদ জোহর বেলা ২ টায় জানাযা।

ঝালকাঠি শহর শোকের শহরে পরিণত হয়েছে। কেবল ঝালকাঠি নয়, সারাদেশ শোকে অধীর। ভোর না হতেই পিঁপড়ার সারির মতো নেছারাবাদ ময়দানে আসতে থাকল মানুষ। ঢল নামল শোকার্ত জনতার। কিন্তু স্থানের তো আর সঙ্কুলান হচ্ছে না। রাস্তায়, নদীর তীরে, আশে পাশের মাঠে, বাগ-বাগিচায় যে যতদূর আগাতে পারছে এসে জমায়েত হচ্ছে। যারা নদী পার হতে পারছে না, ভিড় জমিয়েছে তারা নদীর ওপারে। কত লোক শরীক হতে এলো জানাযায়, সঠিক হিসাব দেয়া মুশকিল। কেউ বলছে পাঁচ লাখ, কেউ দশ লাখ, ইত্তেফাকসহ কয়েকটি পত্রিকা লিখেছে দশ বর্গকিলোমিটার জুড়ে লোকে লোকারণ্য। সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। চারদিকে মাতম, আহাজারী, সবার চোখে অশ্রুর প্লাবন।

জাতি-ধর্ম-বর্ণ, আবালবৃদ্ধবনিতা, পুরুষ-মহিলা সবার কণ্ঠে–হায় আফসুস! ঘরের ছাদে, নৌকায়, লঞ্চে মানুষ আর মানুষ। এসেছেন ছারছীনা, হদুয়া, চরমোনাই, গাজীপুর, গালুয়া, মোকামিয়া, পাঙ্গাসিয়াসহ বিভিন্ন দরবারের পীর সাহেবান। এসেছেন সরকারি অফিসার, বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ। এসেছেন রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক বিভিন্ন সংগঠন ও দলের নেতৃবৃন্দ, কর্মীবৃন্দ। এসেছেন ছাত্র-শিক্ষক, শ্রমিক, মজুর, চাষী। এসেছেন বিভিন্ন মিডিয়ার সাংবাদিক। কেউ বাদ যাননি। সবাই এসেছেন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সালাতে জানাযায় শরীক হতে। এত ভালোবাসা, এত আবেগ লুকিয়ে ছিল কায়েদ সাহেব হুজুরের প্রতি যা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

জানাযার আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা। শপথ নিলেন ভক্ত-জনতা, কায়েদের আরদ্ধ কাজ আমরা সম্পন্ন করব। তার স্বপ্ন আমরা বাস্তবায়িত করব। জানাযায়

ইমামতি করলেন মরহুমের একমাত্র পুত্র তার সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মাওলানা খলীলুর রহমান নেছারাবাদী। মসজিদের পশ্চিম পার্শ্বে, খানকার দক্ষিণ কোণে খনন করা হয়েছে কবর। শয়ন করিয়ে দেয়া হল চিরদিনের মত।

পত্রিকার পাতায় নেছারাবাদীর ইন্তিকাল ও জানাজার নামাজ

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) এর ইন্তিকালের পরের দিন বাংলাদেশের প্রায় সকল পত্রিকায় তার ইন্তিকালের খবর ছাপা হয়েছিল। তার কয়েকটি দেয়া হলো–

১. প্রখ্যাত আলেমে দীন মাওলানা কায়েদ সাহেব হুজুরের ইন্তেকাল

ইনকিলাব রিপোর্ট: বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমীর, ঝালকাঠির প্রখ্যাত আলেমে দীন ও পীরে কামেল, অর্ধশত দীনি প্রতিষ্ঠান ও নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা শতবর্ষী পীর আলহাজ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) গতকাল (সোমবার) সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর কমফোর্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। (দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ এপ্রিল, ০৮ইং)

২. কায়েদ সাহেব হুজুর আর নেই

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (৯৭) আর নেই। ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে সাতটায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। তিনি 'কায়েদ সাহেব হুজুর' নামে সমধিক পরিচিত। পরিবার সূত্র জানায়, বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, তিন মেয়ে ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুর দুইটায় নেছারাবাদ কামিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি অর্ধশত ধর্মীয় বই রচনা করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (দৈনিক প্রথম আলো, ২৯ এপ্রিল '০৮ ইং)

৩. প্রবীণ আলেমে দীন কায়েদ সাহেব হুজুরের ইন্তেকাল

ঝালকাঠি প্রতিনিধি: দেশের প্রবীণতম আলেমে দীন, পীরে কামেল, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক আলহাজ হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী 'কায়েদ সাহেব হুজুর' গতকাল সকাল সোয়া সাতটায় ঢাকার কমফোর্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি,..রাজিউন) তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। গত ২২ এপ্রিল তাকে কমফোর্ট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু তার অবস্থার ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। (দৈনিক আমার দেশ)

৪. প্রখ্যাত আলেম কায়েদ সাহেব হুজুরের ইন্তেকাল

নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমীর, উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন, নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্স-এর প্রতিষ্ঠাতা শতবর্ষী পীর আলহাজ হযরত মাওলানা কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৭টায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার জানাযা আজ মঙ্গলবার বাদ জোহর ঝালকাঠির নেছারাবাদ মাদ্রাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত হবে। (দৈনিক নয়া দিগন্ত, ২৯ এপ্রিল, ০৮ইং)

৫. কায়েদ সাহেব হুজুরের ইন্তেকাল

স্টাফ রিপোর্ট: প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ দার্শনিক ও পীরে কামেল মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী গতকাল সোমবার ভোরে ঢাকায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছির ৯৮ বছর। কায়েদ সাহেব হুজুর হিসেবে পরিচিত বিশিষ্ট এই আলেমে দীন গতকাল ভোর সাতটায় ঢাকার কমফোর্ট হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন। একটি অ্যাম্বুলেন্স যোগে তার লাশ ঝালকাঠিতে পাঠানো হয়। নামাজে জানাযা শেষে তার লাশ নেছারাবাদ কামিল মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে দাফন করা হয়। কায়েদ সাহেবের ইন্তিকালে শোক প্রকাশ করেছেন পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ মাসুম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব রফিকুল ইসলাম আকন্দ। (দৈনিক দিনকাল)

৬. শোক সংবাদ

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও লেখক, ঝালকাঠির বর্ষীয়ান আলেমে দীন আলহাজ মাওলানা মো: আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (কায়েদ সাহেব হুজুর ৯৭) সোমবার ঢাকার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি.....রাজিউন)। আজ মঙ্গলবার বাদ জোহর হুজুরের নামাজের জানাযা অনুষ্ঠিত হবে। তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, তিন মেয়ে রেখে গেছেন। ঝালকাঠি নেছারাবাদ (বাসন্ডা) গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তিনি পিরোজপুর জেলার ছারছীনা দারুসসুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসার ভাইস প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঝালকাঠি নেছারাবাদ ইসলামী কমপ্লেক্সের প্রতিষ্ঠাতা। তার লেখা অর্ধ শতাধিক ইসলামী গ্রন্থ এদেশের ইসলামী জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। হুজুরের ইন্তেকালে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আলহাজ আমীর হোসেন আমু, যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল হক নান্নু, ঝালকাঠি জেলা প্রশাসক হরিপ্রসাদ পাল, আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট আব্দুল মান্নান রসুল,

চেম্বার সভাপতি মাহাবুব হোসেন, প্রেস ক্লাবের সভাপতি অধ্যক্ষ এম এ রশিদ, স্থানীয় দৈনিক শতকণ্ঠ পত্রিকার সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন মনা এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও চট্টগ্রামের ফটিকছড়িস্থ আনজুমানে রহমানিয়া মঈনিয়া মাইজভাণ্ডারিয়ার সভাপতি আলহাজ মাওলানা সৈয়দ সাইফুদ্দীন আহমদ আল হাসানী মাইজভাণ্ডারিসহ দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। (দৈনিক ইত্তেফাক)

৭. নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর মারা গেছেন

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ধর্ম-দর্শন বিষয়ে প্রায় অর্ধশত বইয়ের লেখক হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর আর নেই। গতকাল সকাল ৭টা ১০ মিনিটে রাজধানীর কমফোর্ট হসপিটালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

(যায়যায় দিন, ২৯ এপ্রিল '০৮ ইং)

৮. Obituary

Alhaj Hazrat Maulana Muhammad Azizur Rahman Nesarabadi (Kayed Saheb Hujur) an eminent Islami philanthropist and philosopher, passed away at a city hospital due to old age compli cations on Monday at the age of 98. says a press release.

He left behind his wife. one son. three daughters and a host of relatives, disciples and admirees to mourn his death.

His namaz-e-Janaza will be held at Jhalakathi Nesarabad Madrassa ground at 2:00 pm today.

He was ameer of Bangladesh Jamiate Hijbulla Nazeme Ala and Bangladesh Hijbulla Jamiatul Muslihin. (The Daily Star)

9. Islamic thinker Qayad Saheb laid to rest.

Barisal, Aju 2- eminent Islamic thinker Azizur Rahman Nesarabadi Qayad Saheb Hujur, who died Monday, was laid to test at Jhalakati Sadar Upazila on Tuesday reports UNB.

He was laid to rest at the graw yard near his Khanka Sharif after janaza after Zohur prayers.

Awami league presidium member Amir Hosain Amo. Pirss of Charmonai, Mokamia, Fultiati, Sonata, Galua, leaders of different organizations and many followers participated in the Janaza.

Qayed born in 1911 at Basanda village of Jhalakati. **Died at Basanda village of Jhalakati.** He died at Comfort Hospital in capital at 7:5 am Modnay.

Hearing news thousands of people rushed to Basanda Nesaria Islamic complex and senior Madrasah, Khanka Sharif established by him. His body was brought in Jhalakati from capital onTuesday morning. (The Bangladesh Observer)

10. Noted Islamic scholar laid to rest in Jhalakati.

Our Correspondents, Barisal: Azizur Rahman Nesarabadi alias Qayed Saheb Hujur an eminent Islamic scholar, was laid to rest Islamic scholar, was laid to rest yesterday amid morning by thousands of his followers.

He died at Comfort Hospital in Dhaka on Monday morning. Qayed Saheb Hujur born in 1911 at Basanda village in Jhalakati.

The was survived by his wife, only son and three daughters. The body was brought ot Basanda Nesaria Islamia Complex in Jhalakati yesterday morning Hearing the news, thousands of people rushed there.

His namaj-e-janaja, was held the after Johr prayer. His son Mowlana Khalilur Rahman, principal of the madrasah, led the prayer Awami League Presidum member Amir Hossain Amu. Pir Sahebs of Charmonai. Mokamia and Fultali and leaders of different

political and religious organizations took part in the janaja.

After janaja the body was laid to rest at the graveyard on Basanda Nesaria Islami complex premiss. (The Daily Star, 30 April '08)

১১. মাওলানা আযীযুর রহমানের দাফন সম্পন্ন লাখো মানুষের শ্রদ্ধা

নিজস্ব সংবাদাতা: ২৯ এপ্রিল, ঝালকাঠি। লাখো মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুরের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ২ টায় তার প্রতিষ্ঠিত ঝালকাঠি নেছারাবাদ আলিয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। তার ছেলে মাওলানা খলীলুর রহমান নেছারাবাদী জানাযার নামায পরিচালনা করেন। পরে নেছারাবাদ মসজিদের পাশে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় অংশ নিতে সোমবার দুপুর থেকেই দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে তার অসংখ্য ভক্ত ও অনুরক্ত নেছারাবাদে সমবেত হতে থাকে। কায়েদ সাহেব হুজুরের জানাযায়, ছারছীনা, সিলেটের ফুলতলি, চরমোনাই, মোকামিয়া পীর সাহেবসহ দেশের প্রখ্যাত আলেমগণ অংশ নেন। অপরদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আমির হোসেন আমু, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খানসহ ঝালকাঠির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ জানাযায় অংশ নেন। এদিকে কায়েদ সাহেব হুজুরের মৃত্যুতে তার সম্মানে মঙ্গলবার ঝালকাঠি শহরের সকল দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল, '০৮ ইং)

১২. ঝালকাঠির আলেমে দীন কায়েদ সাহেব হুজুরের দাফন সম্পন্ন

ঝালকাঠি সংবাদদাতা: বাংলাদেশের হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুসলিহীনের আমির হযরত মাওলানা মু.আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুরের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। মঙ্গলবার বাদ জোহর নেছারাবাদ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তার নামাজে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হুজুরের একমাত্র পুত্র এনএস কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা খলিলুর রহমান নেছারাবাদী জানাযা পরিচালনা করেন। জানাযায় অংশ নিতে সারা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে হুজুরের বিপুল সংখ্যক ভক্ত ও অনুরাগী সকাল থেকে নেছারাবাদে হুজুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। কিন্তু প্রায় ১০ মাইল এলাকা জুড়ে মানুষের ঢল নামায় অনেকের পক্ষেই হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই অধিকাংশ মানুষ রাস্তার উপর, মাঠের উপর দাঁড়িয়েই জানাযার নামায আদায় করে। দুপুর আড়াইটার দিকে কায়েদ সাহেব হুজুরের মরদেহ তার খানকার পাশে ফুল বাগানে

সমাহিত করা হয়। তার নামাজের জানাযায় লাখো মুসল্লীর সঙ্গে শরীক হন ছারছীনার পীর মাওলানা শাহ মো. মুহিব্বুল্লাহ, চরমোনাইর পীর মুফতি মাওলানা সৈয়দ মো. রেজাউল করিম, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আলহাজ আমির হোসেন আমু, বরিশাল মহানগর জামায়াতের আমির অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, সিলেটের ফুলতলী পীর মাওলানা মো. হোসামুদ্দিন চৌধুরী, মোকামিয়া পীর মাওলানা মো. ফেরদৌস আহমদ, সোনাউটার পীর মাওলানা বাকের হোসেন, ইনকিলাব নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমিন খান এবং গালুয়ার পীর মাওলানা আঃ হক। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৩০ এপ্রিল '০৮ইং)

১৩. দশ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে লাখো মানুষ:ঝালকাঠি কায়েদ সাহেব হুজুরের জানাযায় শোকার্ত মানুষের ঢল

ঝালকাঠি অফিস: বাংলাদেশ হিযবুল্লাহ জমিয়াতুল মুছলিহীনের আমীর হযরত মাওলানা মু. আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুরের জানাযার নামায গতকাল মঙ্গলবার সুসম্পন্ন হয়েছে। নেছারাবাদ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে জোহর নামায বাদ দুপুর ২ টায় জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। হুজুরের একমাত্র পুত্র এন এস কামিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাও. খলীলুর রহমান নেছারাবাদী জানাজার নামায পরিচালনা করেন। সারাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত লাখ লাখ মানুষ হুজুরের ভক্ত ও অনুরাগীরা সকাল থেকে জোহরের নামাযের সময় পর্যন্ত নেছারাবাদ হুজুরের বাড়ির উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। নামাযের আগেই প্রায় ১০ মাইল এলাকা জুড়ে মানুষের ঢল নামায় অনেক মানুষেরই হুজুরের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হয়নি। তাই মাইকের শব্দ পর্যন্ত মানুষ রাস্তার উপর, মাঠের উপর দাঁড়িয়েই জোহরের এবং জানাযার নামায আদায় করেন। (দৈনিক শতকণ্ঠ, ৩০ এপ্রিল '০৮ইং)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সমসাময়িক আলেম ও সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেছারাবাদীর অবস্থান

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন একজন প্রকৃত আল্লাহর ওলী। তার মধ্যে একই সাথে যে সমস্ত গুণাবলির প্রকাশ ঘটেছে তা অন্য কারো মধ্যে পাওয়া দুষ্কর। জাতির কল্যাণে, মুক্তি ও উন্নয়নের চিন্তায় সর্বদা মগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক। ইলমে তাছাওফে ও তরীকতে তিনি ছিলেন অগাধ জ্ঞানের অধিকারী। বাতিলের সাথে তিনি ছিলেন আপসহীন। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক, তিনি ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের দীন কায়েমের লক্ষে আজীবন ত্যাগ স্বীকার করে গেছেন। তিনি ছিলেন খাঁটি আমানতদার, হৃদ্যতা ও সাম্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়, শ্রমিকের মজুরী ঘাম শুকাবার আগেই তিনি পরিশোধ করতেন। তিনি অতি প্রয়োজনেও কারো নিকট কোন কিছুর জন্য প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যে ছওয়াল করতেন না। দুর্নীতি- দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম চালিয়েছেন আজীবন, ইহকালীন জীবনে ধন-সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন মাওলানা রুমির অনুসারী। তিনি যে কত বড়ো মাপের আলেম তা তার সমসাময়িক ব্যক্তিদের কথার দ্বারাই বুঝা যায়।

১. হুজুর (রহ.) এর মুর্শিদ ছারছীনা শরীফের মরহুম পীর গাওছে যামান, কুতুবুল আকতাব **হযরত মাওলানা শাহ সূফী নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.)** বলেন- "কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছে। আর আমার কায়েদ বিশ্ব বিজয় করবে।"[৩৩১]

২. হুজুর (রহ.) এর মুর্শিদ, পবিত্র কাবা শরীফের মহামান্য সাবেক ইমাম ও খতীব, বিশ্ববরেণ্য আলেম, আওলাদে রাসুল (স.) **সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইনে সাইয়্যেদ আলুভী আল মালেকী আল হুসাইনী (রহ.)** বলেন- "আমার নিজ পাগড়ী আপনাকে পড়িয়ে দিলাম। উলূভী তরীকার খলিফা হিসেবে আপনি আল্লাহ ও তার রাসুলের (স.) দীনকে জেন্দা রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। বিশ্বমানব আপনার খেদমতে ধন্য হবে।"[৩৩২]

৩. **হযরত মাওলানা ওবায়দুল হক সাহেব (রহ.)**[৩৩৩](সাবেক খতীব, বাইতুল মুকাররম

---

৩৩১ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩৩২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩৩৩ খতীব আল্লামা ওবায়দুল হক (রহ.) সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলায় ১৯২৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিজ পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করার পর ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম দেওবন্দ গমন করেন, দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ১৯৪৭ সালে দাওরায়ে হাদিস সম্পন্ন করেন। শায়খুল ইসলাম আল্লামা সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ), আল্লামা ইবরাহীম

জাতীয় মসজিদ, ঢাকা) বলেন- "যে-কোন দেশের যে-কোন সমস্যায় কায়েদ সাহেবকে আমরা সর্বাগ্রে এগিয়ে আসতে দেখি। মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তার দর্শন আমাদের জন্য মাইলফলক হয়ে থাকবে।"[৩৩৪]

৪. ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর **হযরত মাওলানা আবুল আনছার মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাহহার সিদ্দিকী (রহ.) বলেন-** "কায়েদ সাহেব হুজুর ফেরেশতা চরিত্রের এক মহামানব। এমন নিখুঁত চরিত্রের মানুষ সত্যিই মেলে না।"[৩৩৫]

৫. **হযরত মাও. মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম,**[৩৩৬] পীর সাহেব, চরমোনাই বলেন- "বিগত শতাব্দীতে বাংলাদেশে যেসব ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ও ওলীর আবির্ভাব ঘটেছিল আলহাজ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) তাঁদের অন্যতম। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী একজন ইনসানে কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানুষ এবং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণে 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফে'র প্রবক্তা ও বর্তমান সমাজের সংস্কারক। আজ কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) আমাদের মাঝে নেই, আছে তার আদর্শ। ইসলামী সমাজ গঠনের যে চিন্তা তিনি পোষণ করতেন তা আমাদেরকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।"[৩৩৭]

বলিয়াভী(রহ), শায়খুল আদব আল্লামা এজাজ আলী (রহ), মাওলানা আব্দুল হক পেশওয়ারী(রহ) প্রমুখ তার শিক্ষক।

দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে ফারেগ হওয়ার পর সর্বপ্রথম ঢাকা বড়ো কাটরা মাদ্রাসায় মুহাদ্দিস পদে আত্মনিয়োগ করেন, পরবর্তীতে দারুল উলুম করাচীতে শিক্ষকতা করেন। সেখানে তিনি কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর পুনরায় ঢাকায় ফিরে তিনি যোগদান করেন ঐতিহ্যবাহী ঢাকা আলিয়ায়। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা আলিয়ায় শিক্ষকতার শেষ থেকে আমৃত্যু বাংলাদেশ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের খতীবের দায়িত্ব পালন করেন,পরবর্তীতে তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ মাদ্রাসা এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আজিমপুর মাদ্রাসার শায়খুল হাদিস ছিলেন, তা ছাড়াও তিনি দেশের অগণিত মাদ্রাসার মজলিশে শূরার সদস্য এবং সভাপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি হযরত মাদানী (রহ.) এর একজন মুরিদ এবং আমিরে শরিয়ত মাওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ হাফিজ্জী হুজুর (রহ.)-এর একজন খলিফা। ২০০৭ সালের ৬ ই অক্টোবর পবিত্র রমজান মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৩৩৪ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪

৩৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৩৩৬ সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম, জন্ম: ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১, যিনি পীর সাহেব চরমোনাই নামে অধিক পরিচিত। একজন ইসলামী পণ্ডিত, হানাফি সুন্নি আলেম, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ধর্মীয় আলোচক ও সমাজ সংস্কারক। বর্তমানে তিনি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটি ও বাংলাদেশ কুরআন শিক্ষা বোর্ডের সভাপতি এবং বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশের সহ-সভাপতি। তিনি দুই মেয়াদে চরমোনাই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

৩৩৭ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৬. **কবি ফররুখ আহমদ বলেন**[৩৩৮]- "মাওলানা সাহেব! আপনি শুধু আপনার কলমের আঁচড় দিয়ে যান, আজ হোক কাল হোক একদিন আপনার এ লেখা কথা বলবে। জাতি তার প্রয়োজনেই আপনার খোঁজ খুঁজবে।"[৩৩৯]

৭. **ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (রহ.)**, (প্রফেসর (অবঃ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া) **বলেন**- "আমরা তাকে দেখেছি অতি নিকট থেকে। সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ, কথায় ও কাজে অভিন্ন, এহসান ও আদলের মূর্ত প্রতীক, হক ও ইনসাফ কায়েমে আপসহীন, দলীয় রাজনীতিমুক্ত মদীনার নবুওয়াতি রাজনীতির অনুসারী, শরীয়ত ও মা'রেফতের প্রকৃত সমন্বয়ক, কুরআন-সুন্নাহর নিখাঁদ-সেবক, ইসলামের নামে আবেগ-উচ্ছ্বাসের জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসের বিরোধী, ইসলামের মৌল শিক্ষার পরিবর্তে ছোটো-খাট বিষয়ে মতভেদ পয়দা করে ফতোয়াবাজী করার ঘোর বিরোধী, তিনি বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের জন্য 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ' নীতির প্রচলন করেন এবং এর জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। যারা তাঁকে নিকট থেকে দেখেছি আর যারা এ সুযোগ লাভ করিনি কিন্তু পরোক্ষভাবে জেনেছি, তারা যেন এ মর্দে মুমিন, মুজাদ্দিদে যামানের জীবনকে আদর্শরূপে গ্রহণ করি।"[৩৪০]

৮. **প্রফেসর ড. এম শমশের আলী**[৩৪১] (পদার্থ বিজ্ঞানী, প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর,

---

৩৩৮ মুসলিম রেনেসার কবি ফররুখ আহমদ মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার মাঝাইল গ্রামে ১৯১৮ সালের ১০ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ছিলেন এবং মায়ের নাম রওশন আখতার। তিনি 'মুসলিম রেনেসাঁর কবি' হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। তার কবিতায় অধঃপতিত বাংলার মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি ইসলামী ভাবধারার বাহক হলেও তার কবিতা শব্দচয়ন এবং বাকপ্রতিমার অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিকতার সব লক্ষণ তার কবিতায় পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে তিনি বাংলা একাডেমি, ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদক 'প্রাইড অব পারফরমেন্স' এবং ১৯৬৬ সালে আদমজী পুরস্কার ও ইউনেসকো পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭৪ সালের ১৯ অক্টোবর কবি ফররুখ আহমদ ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩৩৯ দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান, প্রাগুক্ত,পৃ. ৪৪

৩৪০ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৩৪১ আন্তজার্তিক খ্যাতিসম্পন্ন পরমানু বিজ্ঞানী ড. এম শমশের আলী ১৯৩৭ সালের ২১ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক সূত্রে তিনি যশোর সদর থানার সিঙ্গিয়া গ্রামের বাসিন্দা। পিতার নাম আমীর আলী মা রহিমা খাতুন । পিতা-মাতার ১২ সন্তানের মধ্যে ড. শমশের আলী ৪র্থ এবং ভাইদের মধ্যে তৃতীয়। পাকিস্তান আনবিক শক্তি কমিশনে ১৯৬১ সালে সান্টিফিক অফিসার পদে নিয়োগ দানের মধ্য দিয়ে তাঁর চাকরি জীবন শুরু হয়। জনাব শমশের আলী ১৯৬০ সালে কমনওয়েলথ স্কলারশিপ অর্জন করেন। তিনি সেই থেকে জীবনে বহু ল্যাবরোটারীতে কাজ করেছেন। ঘুরেছেন সারা বিশ্বে। পি. এইচ. ডি ডিগ্রী লাভ করার পর ১৯৬৫ সালে দেশে ফিরে এসে ড. শমশের আলী ঢাকায় আনবিক শক্তি কেন্দ্রে যোগ দেন। কর্মদক্ষতার জন্য তিনি ১৯৭০ সালে অত্যন্ত অল্প বয়সে আনবিক শক্তি কমিশনের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান এবং ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘ ২১ বছর যাবৎ ড. আলী আনবিক শক্তি কমিশনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল ছিলেন।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত তিনি এটমিক এনার্জি সেন্টারের ডাইরেক্টর ছিলেন। তাঁর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং রিসার্স কাজের জন্য ১৯৭৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটা স্পেশাল সাইটেশনের মাধ্যমে তাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনারারী প্রফেসর অব ফিজিক্স করে তাঁকে একটা বিরল সম্মাননা প্রদান করে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ভাইস চ্যান্সেলর, সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।) **বলেন-** "হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন এক অনুকরণীয় আদর্শ। হিন্দু, মুসলিম সকলেই তাদের বিপদমুক্তি ও আত্মিক প্রশান্তির উদ্দেশ্যে তার সান্নিধ্যে আগমন করতো। এ মহান ওলী ও অনুপম সাধক কেবল নৈতিক ও ধর্মীয় নির্দেশনা প্রদান করেই ক্ষান্ত হননি বরং সৎ জীবন পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে গেছেন।"[৩৪২]

৯. **এ এম এম বাহাউদ্দিন** (সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব সভাপতি, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদারেছীন) **বলেন-** "বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এ উপমহাদেশে ইসলাম প্রচারে যেসব পীর মাশায়েখ, আউলিয়ায়ে কেরাম এসেছেন তাঁদেরই যুগশ্রেষ্ঠ উত্তরসূরী হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)। তার বক্তব্য ও লেখনীর বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উগ্রতা পরিহার, সহনশীল আচরণ ও সুন্দর ব্যবহার করা। হুজুর (রহ.) এ দেশের ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা কী হবে তাও বর্ণনা করে গেছেন। হুজুর (রহ.)-কে আমরা যদি শুধু একজন পীর বা মাশায়েখ মনে করি তবে ভুল হবে; তিনি ছিলেন বড়ো মাপের একজন দার্শনিক, সংস্কারক এবং অনুসরণীয় ব্যক্তিত্ব।"[৩৪৩]

১০. **মাওলানা মুহিউদ্দীন খান**[৩৪৪], (সম্পাদক, মাসিক মদীনা) **বলেন-** "কায়েদ সাহেব (রহ.) গভীর দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাংলাদেশের আলেম সমাজ ও দীনদার মুসলমানদের জন্য কী ধরনের বিপর্যয় অপেক্ষা করছে। এজন্যই তিনি 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফ' এর ডাক দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় হলো তার ডাকে কেউ কেউ তা ভ্রূক্ষেপই করেননি; আর যারাও সাড়া দিয়েছিলেন, তারা মাত্র মুরব্বীর সম্মান দেখিয়ে মৌখিকভাবে একত্মতা ঘোষণা করলেও মূলত তার যে আকুতি ছিল সেটাকে

১৯৮২ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। ১৯৯২-১৯৯৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সাল হতে ২০১০ সাল সময় পর্যন্ত সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩৪২ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৩৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

৩৪৪ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান ১৯৩৫ সালের ১৯ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার ছয়চির গ্রামে নানার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন । পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলার আনসার নগরে। পিতা বিশিষ্ট সাধক পুরুষ, প্রবীণ শিক্ষাবিদ মৌলভী হাকিম আনছার উদ্দিন খান, মাতা মোসাঃ রাবেয়া খাতুন। তিনি একজন বাংলাদেশী সাংবাদিক, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ, বহু গ্রন্থ প্রণেতা ও মাসিক মদীনার সম্পাদক। ২০১৬ সালের ২৫ জুন ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। মারা যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তিনি মাসিক মদীনার সম্পাদক ছিলেন পাশাপাশি তিনি মুফতী মুহাম্মাদ শফী উসমানীর রচিত মা'রেফুল কোরআনের বাংলা অনুবাদ করেছেন।

কার্যকরভাবে গ্রহণ করার মতো অন্তরের প্রশস্ততা তাদের ছিল না। কায়েদ সাহেব ইন্তেকাল করলেন। অথচ ইসলাম রক্ষার জন্য তিনি যে মূল্যবান দর্শন রেখে গেলেন, তা নিয়ে আলেম সমাজের এতটুকু মাথা ব্যথাও দেখছি না। আমাদের অনুভূতিহীনতার এই যে রোগ; এটাই আমাদেরকে অতিদ্রুত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।"[৩৪৫]

১১. হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রহ.) এর সাহেবজাদা **হযরত মাওলানা শাহ্ আহমাদুল্লাহ আশরাফ**[৩৪৬] **বলেন**-"হযরত কায়েদ সাহেব! তিনি প্রকৃতই একজন কায়েদ ছিলেন। তিনি বারবার 'ইত্তেহাদ মায়াল ইখতেলাফে'র কথাই বলেছেন। তার আরজু ছিল, ইত্তেহাদ-ইত্তেহাদ। তিনি বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় যে সব অবদান রেখে গেছেন তা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসা আমাদের দায়িত্ব।"[৩৪৭]

১২. **রুহুল আমীন খান,** (নির্বাহী সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব) **বলেন**-"সাহাবায়ে কেরামদের আমরা দেখিনি। তাঁদের কথা পড়েছি ইতিহাসে। তাঁদের ইখলাস-লিল্লাহিয়াত, ত্যাগ-কুরবানী, আদর্শনিষ্ঠার কথা পড়ে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি। একালে দুনিয়ার প্রতি, সম্পদের প্রতি, আড়ম্বরের প্রতি নিরাসক্ত নির্মোহ ব্যক্তিত্ব পাওয়া দুষ্কর। সেই অনুপম চরিত্রের মানুষগুলোর কথা আমার মানসপটে যে রূপে অংকিত হয়েছে, তাদের যে চিত্র, যে ছবি আমার মনে বারবার উঁকি দিচ্ছে, আমার পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ কায়েদ সাহেব হুজুর হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) ছিলেন যেন তাদেরই প্রতিচ্ছবি। তার ছাত্র হিসেবে, ভাবশিষ্য হিসেবে, আন্দোলনের কর্মী হিসেবে, সহকর্মী হিসেবে সুদীর্ঘ অর্ধশত বছরের আমার যে অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতার নিরিখে আমি এ বিশেষণ ছাড়া তাঁকে অন্য কোন বিশ্লেষণে বিশেষায়িত করতে পারছি না।"[৩৪৮]

---

৩৪৫ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৪৬ শাহ আহমদ উল্লাহ আশরাফ ১৯৪২ সালে ঢাকার লালবাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাফেজ্জী হুজুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের সাবেক আমির ও জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়ার মহাপরিচালক। তিনি বড়োকাটারা ও লালবাগ মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। এরপর করাচীর জামিয়া ইসলামিয়া বিন নূরী টাউন মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৯৬৩ সালে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররমে প্রধান মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পান। তিনি ঢাকার জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, আমীনবাজারস্থ মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসা ও লক্ষীপুরের লুধুয়া এশাআতুল উলুম মাদ্রাসার একই সাথে প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। আহমদ উল্লাহ ১৯৮৭ সালের ৭ মে তার পিতার মৃত্যুর পর বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের আমির নির্বাচিত হন এবং একটানা ২৭ বছর আমিরের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি কয়েক বার ব্রেন স্ট্রোক ও ডায়াবেটিকসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৭ টায় রাজধানীর ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩৪৭ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

১৩. বিচারপতি **সুলতান হোসেন খান**,[৩৪৯] (সাবেক চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন) **বলেন-** "কায়েদ সাহেব সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে বলা যায় না। সকলের হাতকে কাজে লাগানো, লোকদের চরিত্র গঠন এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন। তার গড়া ৪২টি প্রতিষ্ঠান তার চরিত্রের, কর্মের মস্তবড়ো নিদর্শন হয়ে থাকবে।"[৩৫০]

১৪. **অধ্যাপক আব্দুল গফুর**,[৩৫১] (প্রখ্যাত সাংবাদিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী ও ভাষাসৈনিক) **বলেন-** "আজ দেশে-বিদেশে সর্বত্র মহৎ আদর্শের যে দুর্ভিক্ষ দেখা যাচ্ছে, তার মূলে রয়েছে স্রষ্টার দেয়া বিশ্বজনীন আদর্শ অনুসরণে একশ্রেণির প্রভাবশালী মানুষের প্রবল অনীহা। বাংলাদেশে রাজনীতির নামে আজ চলছে অপরাজনীতির ডামাডোল। যারা ইসলামের নামে রাজনীতি করছেন তারাও ইসলামের মূল প্রাণশক্তি লিল্লাহিয়াত তথা আধ্যাত্মিকতাকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তিগত অথবা দলগত প্রতাপ-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির বাইরে ইসলামের সাম্য-ভ্রাতৃত্বের মহান আদর্শে সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন–এই করুণ প্রেক্ষাপটে কায়েদ সাহেব হুজুরের মহৎ জীবন ও কর্মধারার আদর্শে এগিয়ে আসাই হচ্ছে সময়ের দাবী।"[৩৫২]

১৫) **মুহাম্মদ আব্দুল জব্বার**, (মহাসচিব, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ) **বলেন-** হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুজুর্গ, প্রখ্যাত আলেমে দীন ও জাতির ধর্মীয় রাহবর। তার বিয়োগে জাতি একটি বিরাট শূন্যতা অনুভব করছে। এ শূন্যতা অপূরণীয়।[৩৫৩]

---

৩৪৯ ১৯২৫ সালে বাংলাদেশের ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। ১৯৭৮ সালের ১৩ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান তিনি। ১৯৯০ সালের ১ জানুয়ারি অবসরে যাওয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) হিসেবে নিয়োগ পান বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। এরপর ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নেন তিনি। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন বিচারপতি সুলতান হোসেন খান। ০৪ জুলাই ২০১৫ রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন।

৩৫০ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

৩৫১ ভাষা সৈনিক আবদুল গফুর ১৯২৯ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার দাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নামে হাজী হাবিল উদ্দিন মুন্সী ও মাতার নাম শুকুরুন্নসা খাতুন। তিনি একজন বাংলাদেশি সাংবাদিক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও ভাষা সৈনিক। ১৯৪৫ সালে স্থানীয় মইজুদ্দিন হাই মাদ্রাসা থেকে মাধ্যমিক ও ১৯৪৭ সালে কবি নজরুল সরকারি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হন। তিনিসহ এ বিভাগে তখন মাত্র তিনজন শিক্ষার্থী ছিলেন। ভাষা আন্দোলন শুরু হলে আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি অংশ নেওয়ার ফলে লেখাপড়ায় কিছুটা ব্যাঘাত ঘটলেও ১৯৬২ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগ থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন।

৩৫২ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

৩৫৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২

অমুসলিমদের দৃষ্টিতে হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.)

হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন সকল মানুষের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণির মানুষেরাই তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন। হুজুর কেবলা তার চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারাই সবার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) সম্পর্কে অমুসলিমদের কিছু-কিছু মন্তব্য আমি এখানে বর্ণনা করতেছি। এতেই সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, হুজুরের প্রতি তাদের কতখানি শ্রদ্ধা ও সু-ধারণা ছিল।

১. বিমল কুণ্ড (ঝালকাঠির সাবেক জেলা প্রশাসক, সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ রাইটার্স ক্লাব) বলেন-"বহুদিন ধরে আমি কোন জীবন্ত আদর্শ মানুষের সন্ধান করছি। ঝালকাঠির মাটিতে পা দিয়ে প্রথম দিনই আমি পরিপূর্ণ আদর্শিক একজন মানুষের সন্ধান পেলাম। কায়েদ সাহেব হুজুর শুধু একজন ধর্মীয় নেতা বা শিক্ষাবিদ-ই ছিলেন না। তার প্রতিভা ছিল বহুমুখী। তিনি অবাধে জ্ঞানের রাজ্যে বিচরণ করেছেন। তিনি শুধু মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও শান্তি কামনা করেননি বরং বিশ্ব শান্তির জন্য পৃথিবীর প্রতিটি জাতি ও ধর্মের ঐক্য কামনা করেছেন।"[৩৫৪]

২. ড. সুকোমল বড়ুয়া,[৩৫৫] সভাপতি, (আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ ফেডারেশন বাংলাদেশ। অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। চেয়ারম্যান, প্রধান চার ধর্মের জাতীয় সংগঠন সি আই এইচ বাংলাদেশ।) **বলেন-** "মহাপুরুষেরা কোনো জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেন না। আবদ্ধ থাকেন না কোনো প্রাচীরের গণ্ডিতে। তাঁদের মানবতাবাদী শিক্ষা ও কল্যাণে সমগ্র মানবজাতি উপকৃত হয়। হযরত কায়েদ সাহেব ছিলেন তেমনই একজন মহাপুরুষ। তিনি সূর্য-চন্দ্রের মতো বিশ্বের সকলের, সকল মানব গোষ্ঠির।"[৩৫৬]

৩. ড. ফাদার তপন ডি রোজারিও, (ধর্ম যাজক ও ভ্যাটিক্যান পোপের বাংলাদেশস্থ সংস্থা প্রধান, পুরোহিত। অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।) **বলেন-**"তার (হযরত কায়েদ সাহেব হুজুরের) দর্শন ও সংস্কার আমাদের অন্ধকার ভেদ করে এগিয়ে চলার আলোকিত আশা। নদীতে যেমন নাবিক পথ হারিয়ে আকাশের তারার দিকে চেয়ে-চেয়ে সামনে এগিয়ে যায়,

---

৩৫৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

৩৫৫ সুকোমল বড়ুয়া ১৯৫২ সালে চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলার ঢেমশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গণেশচন্দ্র বড়ুয়া ও মাতা বুদ্ধিমতি বড়ুয়া, তিনি পিতামাতার তৃতীয় সন্তান। তিনি একজন শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক। শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার তাকে ২০০৬ সালে একুশে পদকে ভূষিত করে। বড়ুয়া রাঙ্গুনিয়া কলেজে প্রভাষক পদে যোগদানের মাধ্যমে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি হাসিনা জামাল ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

৩৫৬ হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

আমরাও তেমনি তার জীবন, শিক্ষা ও নেতৃত্ব থেকে একটি পথ নির্দেশ খুঁজে পাই।"[৩৫৭]

৪. **হরি প্রসাদ পাল,** (সাবেক জেলা প্রশাসক, ঝালকাঠি) **বলেন-**"হযরত কায়েদ সাহেব হুজুরের যে দিকটি সমাজকে বেশি আলোড়িত ও প্রভাবিত করেছে তা হচ্ছে তার অনুপম চরিত্র। তার চরিত্রে এমন একটি দিকও পাওয়া যাবে না যা মানুষকে সত্যিকারের মানুষ হতে উৎসাহিত করেনি। তিনি ছিলেন এখন অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বের পথিকৃৎ এবং আমরণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার। তিনি তার জীবনে দেশ, জাতি ও সমাজকে যা দিয়ে গেছেন সত্যিই অতুলনীয়। তার মত মহান ব্যক্তির তুলনা হয় না। তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই।"[৩৫৮]

৫. **মানিক লাল ঘোষ** (সাংবাদিক, রিপোর্টার, মাই টিভি) **বলেন-**"অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে, যুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে হুজুর ছিলেন সদা সোচ্চার। বেহায়াপনা, মদ, জুয়ার বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছেন। আমরণ তিনি নিজেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মিছিলে যোগ দিতেন। মিছিল সমাবেশে নেতৃত্ব দিতেন। তার জীবদ্দশায় এমন কোনো ব্যক্তি ছিল না, যে ব্যক্তি হুজুরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোনো অন্যায় কাজ করতে সাহস পেত। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙ্গার প্রতিবাদে যখন বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হয়েছে, তখন তার অঙ্গুলি নির্দেশে ঝালকাঠিতে এর কোনো ছাপ পড়েনি। তার মৃত্যুতে হাজারো হিন্দুদেরও ঢল নেমেছিল, তাদের প্রিয় লোকটি, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে এক নজর দেখার জন্য।"[৩৫৯]

৬. **অধ্যাপক পার্থসারথি দাস,** (ঝালকাঠি) **বলেন-**"কায়েদ সাহেব হুজুরের মহাপ্রয়াণে আমরা আজ অত্যন্ত মর্মাহত, মনে হয় আজ ইয়াতীম হয়ে গেছি।"[৩৬০]

মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (র) জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের তিনি প্রিয় ছিলেন। তিনি একাধারে দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ, লেখক-গবেষক, চিকিৎসক ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির রূপকার মানবদরদী আদর্শ মানুষ। তাঁর গোটা জীবন ইসলাম ও মুসলমান ও মানবতার কল্যাণে নিবেদিত ছিল। হযরত মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী তাঁর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে অমর হয়ে থাকবেন।

---

৩৫৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৩৫৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩
৩৫৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫
৩৬০ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

উপসংহার

মাওলানা মুহম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী আমাদের জন্য এক উজ্জল নক্ষত্র। তিনি তার চিন্তা ও দর্শন দিয়ে একটি আদর্শ জীবন, আদর্শ সমাজ, একটি আদর্শ রাষ্ট্র কায়েমের লক্ষে নিরলসভাবে পরিশ্রম করেন। কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) ছিলেন সত্যিকারে নবীগণের অনুসারী। দীনের জন্য সারাটা জীবন তিনি উৎসর্গ করে গেছেন। দীনের প্রকৃত শিক্ষা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে তিনি নিরলস প্রচেষ্টা করে গেছেন। যা তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান, লিখিত কিতাব এবং তার বক্তব্যে সু-স্পষ্ট ফুটে উঠে। তার জীবন আদর্শ ভালোভাবে গ্রহণ করলে সত্যিকারে দীনি শিক্ষা পাওয়া সম্ভব। তিনি ১৯১১ খ্রি. জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৮খ্রি. ৯৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তার এই ৯৬ বছরের জীবনটা জ্ঞানার্জন, চাকুরি, ইসলামের উন্নতি, হেফাজাত ও পথ হারা মানুষকে দীনের পথে আনার কঠিন সংগ্রামে ব্যয় করেছেন। এ সময়ে তিনি তার লাখ লাখ ভক্ত অনুরক্ত ও মুরিদদের দিয়েছেন তালিম তরবিয়াত। বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন আমরণ। লিপিবদ্ধ করেছেন শতাধিক কিতাব। তার এ সকল লেখনীর মধ্যে ঈমানের বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ বর্ণনা, ঈমান বিধ্বংসকারী শিরক, কুফর ও বেদায়াত সম্পর্কে রয়েছে বিস্তারিত আলোচনা।

* এলমে তাছাওফের উপরে রয়েছে বিশদ আলোচনা যা দ্বারা মানুষ সত্যিকারে তাছাওফ সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারে। ইসলামী আকিদা বিশুদ্ধ করণে তার রয়েছে বিরাট ভূমিকা। বিভিন্ন গ্রন্থে তিনি ঈমান আকিদার বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছেন। বিশেষ করে আহলে সুন্নত অল জামায়াতের পরিচয় ও আকায়েদ নামে একটি আকিদা গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা বিশুদ্ধ আকিদা সৃষ্টিতে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে চলছে।
* মসজিদ মাদ্রাসা ও খানকা তৈরির ক্ষেত্রে তার অবদান খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বাংলাদেশের আনাচে কানাচে অনেক ধর্মীয় মার্কাজ প্রতিষ্ঠা করেন।
* ইসলাম প্রচার ও প্রসারে, সমাজ ও সভ্যতার সংশোধনে ভারতীয় উপমহাদেশের গ্রামগঞ্জ সফর করে তিনি যে সব ওয়াজ ও বক্তৃতা প্রদান করেছেন তার পরিমাণ অগনন।
* মাজার পুজারি, কবর পুজারি ও পীর পুজারিদের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন বজ্র কঠিন। ভেঙ্গে দিয়েছেন তাদের শিরক-কুফর ও বেদায়তের বিষদাঁত। গড়ে তুলেছিলেন একদল দীনের সত্যিকারের দায়ী।
* দীন শিক্ষাকে সমুজ্জল করতে তিনি দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অসংখ্য ইলমে দীনের মার্কাজ। যা যুগ থেকে যুগান্তরে তৈরি করে যাবে তার মত মর্দে মুজাহিদ। তার

প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আজও ইসলামের সুমহান আদর্শের বিচ্ছুরণ ঘটাচ্ছে, ফলে এ সকল প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতি বছর বের হচ্ছে হাজার হাজার ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত একদল নবী প্রেমিক। তিনি কেয়ামত পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন মানুষের মাঝে এ সকল দীনি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে।

* মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদীকে কেউ সমাজ সংস্কারক হিসেবে, কেউ তাকে আধ্যাত্মিক রাহবার হিসেবে, কেউ তাকে একজন মানব দরদী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
* তিনি নিজের আধ্যাত্মিক পীর শাহ নেছারুদ্দীন আহমদ (রহ.) এর জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন দীন শিক্ষার প্রসারের জন্য। তিনি ছিলেন একজন সত্যিকারের নেতা। একজন নেতার সমস্তগুণই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তিনি ছারছীনা শরীফে অবস্থানকালে এবং পরবর্তীতে যে সমস্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন সে সমস্ত সংগঠনগুলো মানুষকে সত্যিকারে মুসলমান হতে সাহায্য করে আসছে।
* তিনি সারাটা জীবন মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করতেন মুসলমানদের হারানো গৌরব ও শক্তি পুনরুদ্ধার করতে হলে মুসলিম মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিকল্প নাই। এর জন্য তিনি "আল ইত্তিহাদ মা'আল ইখতিলাফ (মতানৈক্য সহ ঐক্য)" থিউরী দিয়ে গেছেন।

এই মহান ব্যক্তিত্বের সংস্কার ও ধর্মীয় রাহবারী সম্পর্কে পরিশেষে বলা যায় মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) এই শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। তার সোনালি দিনের কর্মতৎপরতা ও পরিধি সঠিকভাবে উদঘাটন করা হয়ত এই গবেষণাকর্মে সম্ভব হয়নি। নানাবিধ প্রতিকূলতা, অযোগ্যতা, অদক্ষতা ও যথাযথ ভাষা জ্ঞানের অভাবে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। তবে বলা যেতে পারে এই গবেষণা কর্মটি মাওলানা আযীযুর রহমান নেছারাবাদী (রহ.) এর জীবন ও অবদান উদঘাটনের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। এরপর যে কোন গবেষক এই বিষয়টি আরও উন্নত, ফলপ্রসূ করে দেশ ও জাতির খেদমতে পেশ করতে পারবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

আল-কুরআনুল কারীম :

আবূ দাঊদ সুলায়মান ইবনুল আশআস : আস-সুনান (দিল্লিঃ মাকতাবা রাশীদিয়া, তা.বি.), খ.১

আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ : সহীহ মুসলিম (দেওবন্দঃ মুখতার প্রকাশনী, ১৯৮৬ খ্রি.)

আবদুল হক ফরিদী : মাদরাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫খ্রি.)

আবদুস সাত্তার : আলীয় মাদ্‌রাসার ইতিহাস, মোস্তফা হারুন অনূদিত (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০খ্রি.)

অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ : এই সেই ঝালকাঠি, (ঝালকাঠিঃ আল ইসলাম পাবলিকেশন্স, নভেম্বর, ২০০১ খ্রি.), ১ম সংস্করণ।

অধ্যক্ষ আলহাজ মোঃ ইসমাইল হোসেন : বীর মুজাহিদ পীর শাহ মোঃ ছালেহ (রহ.) (পিরোজপুরঃ ছারছীনা দারুচ্ছুন্নাত লাইব্রেরি, ২০০৫ খ্রি.), ১ম প্রকাশ।

খলীফা হুসাঈন আল্ আস্‌সালা : মাআলিমুদ দা'ওয়াতিল ইসলামিয়া ফি আহাদিহাল মাক্কী (কায়রো : দারুত্ তাবিআতুল মুহাম্মাদিয়াহ্, ১৯৮৮ খ্রি.), খ.১।

মুহিব্বুল্লাহ জামী : দার্শনিক কায়েদ সাহেব (রহ.) জীবন ও অবদান (ঢাকাঃ বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন, মে, ২০০৯ খ্রি.), ৩য় মুদ্রণ।

মুহাম্মদ আযীযুর রহমান নেছারাবাদী : দুর্নীতির সংজ্ঞা ও উহা দমনের কর্মসূচি (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নভেম্বর, ১৯৮১), ৪র্থ মুদ্রণ।

" : তাজভিদুল কোরআন, (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১১), ৮ম মুদ্রণ ।

” : আধুনিক বাংলা মীলাদ শরীফ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, মার্চ, ২০১২), ৭ম প্রকাশ।

” : ইসলাম ও তাছাওফ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১২), ১০ম মুদ্রণ।

” : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের পরিচয় ও আকায়েদ (ঝালকাঠি নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১২), ৮ম মুদ্রণ।

” : হাকীকতে ইলমে দীন (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৩), ৫ম মুদ্রণ।

” : ইসলামী জিন্দেগী (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জুন, ২০১৩), ১৪ তম সংস্করণ।

” : মত ও পথ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারী, ২০১৪), একাদশ প্রকাশ।

” ছোটদের ক্বিরাত শিক্ষা (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ডিসেম্বর, ২০১৪), ৫ম মুদ্রণ।

” : মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) এর কামইয়াবী ও কর্মপদ্ধতি (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ।

” তামীরে আখলাক (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫), ৫ম মুদ্রণ।

Dhaka University Institutional Repository

”		এরশাদুন্নবী (স.) ও আখলাকুন্নবী (স.), (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, অক্টোবর, ২০১৫), ২য় মুদ্রণ।
”		ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা ও উহার পথ (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, নভেম্বর, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ।
”		হেদায়াতে কুরআন (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফম ডিসেম্বর, ২০১৫), ৪র্থ মুদ্রণ।
”		আমাদের শক্তির তিনটি উৎস (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), ৩য় মুদ্রণ।
”		দোজাহানের সম্বল (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, মার্চ), ৭ম মুদ্রণ।
”		কেয়ামতের আলামত (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, এপ্রিল, ২০১৭), ৯ম মুদ্রণ।
মুহাম্মদ রফীকুল্লাহ নেছারাবাদী	:	হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর কেবলার নসীহত ও অসিয়ত (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, সেপ্টেম্বর, ২০১৬), ১ম প্রকাশ।
”	:	হযরত কায়েদ সাহেব হুজুর (রহ.) জীবন ও কর্ম (ঝালকাঠিঃ নেছারাবাদ হিযবুল্লাহ দারুত্তাছনীফ, জানুয়ারি, ২০১৭), ৪র্থ মুদ্রণ।
শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দেছে দেহলভী	:	আল-কাউলুল জামিল মা‘ শারহে শিফাউল আলীল (তা.বি.)

Dhaka University Institutional Repository

অভিধান, বিশ্বকোষ ও অন্যান্য:

আবুল ফযল মাওলানা আব্দুল হাফিয	:	মিসবাহুল-লুগাহ (ভারত: মাকতাবা বুরহান, ১৪০৬হি./১৯৮৬খ্রি.)
মুহাম্মদ আলা উদ্দিন আযহারী	:	আরবী-বাংলা অভিধান (ঢাকা : বাংলা একাডেমী ১৯৯৩ খ্রি.), খ.২।
ড. ইবরাহীম আনীস	:	আল-মুজামুল ওয়াসীত, খ.২, তা.বি.
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	:	ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৪১৩ বাং)।
সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত	:	ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০১৪ খ্রি.), খ. ১২শ।
”	:	(ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৭ খ্রি.), খ.৩।
	:	ঢাকা: ই.ফা.বা., নভেম্বর, ১৯৯০খৃ., খ-৯।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

মাওলানা মুহাম্মদ আযীযুর রহমানর নেছারাবাদী (১৯১১-২০০৮খ্রি.)

Dhaka University Institutional Repository

আযীযুর রহমানর নেছারাবাদী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যবাহী ঝালকাঠি এনএস কামিল মাদ্‌রাসা ও জিনাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসা

Dhaka University Institutional Repository

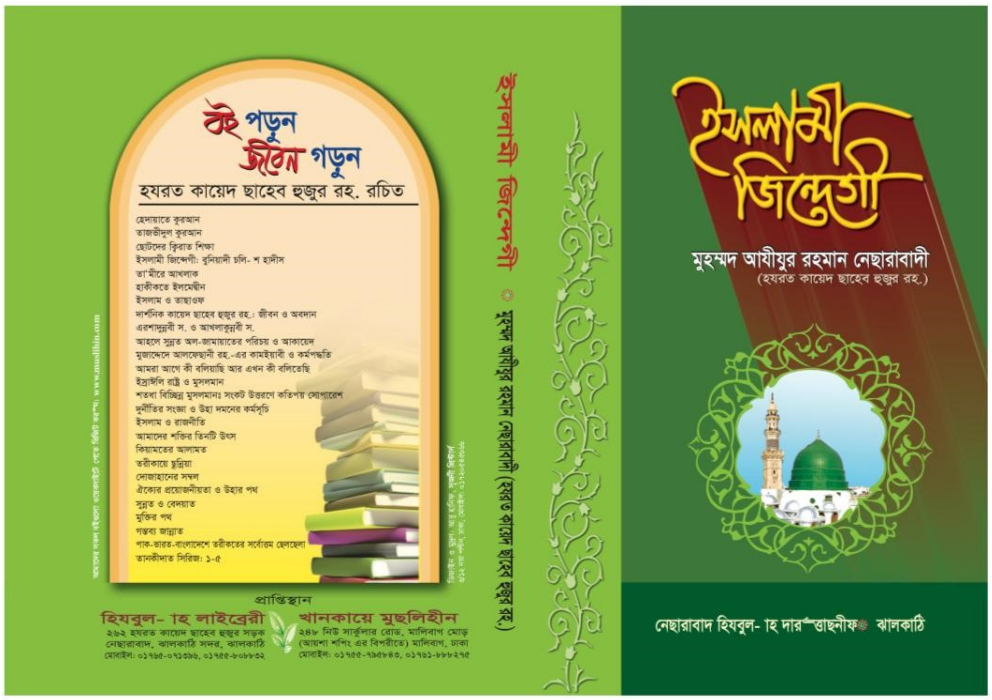

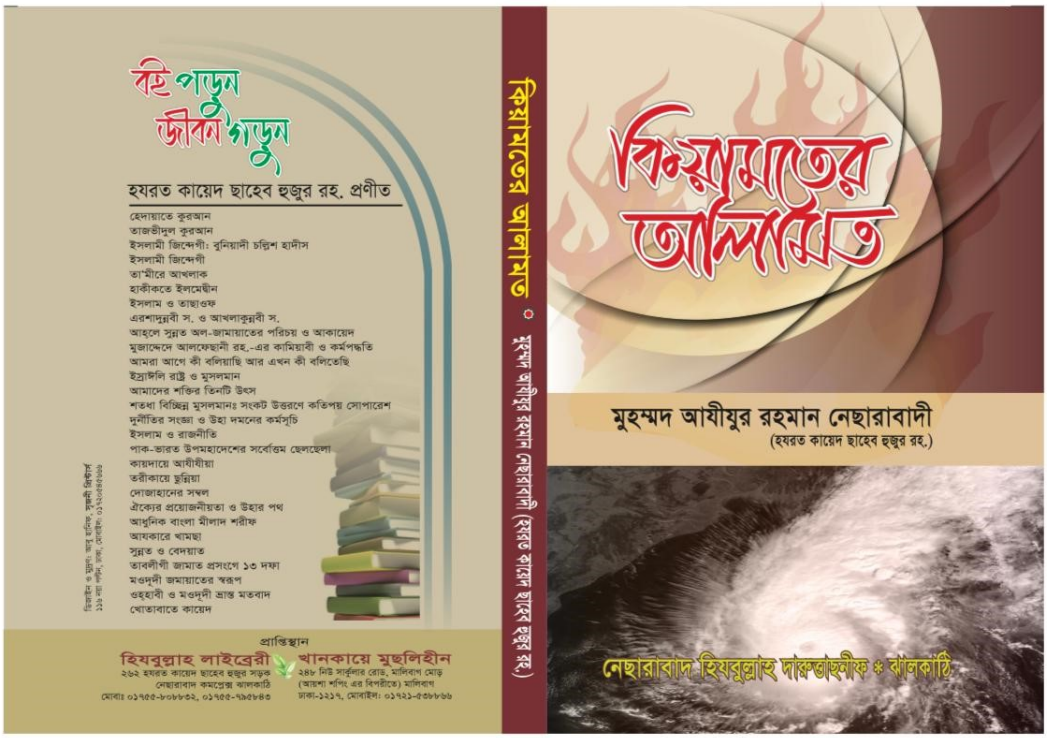

মাওলানা আযীযুর রহমানর নেছারাবাদী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ

Dhaka University Institutional Repository

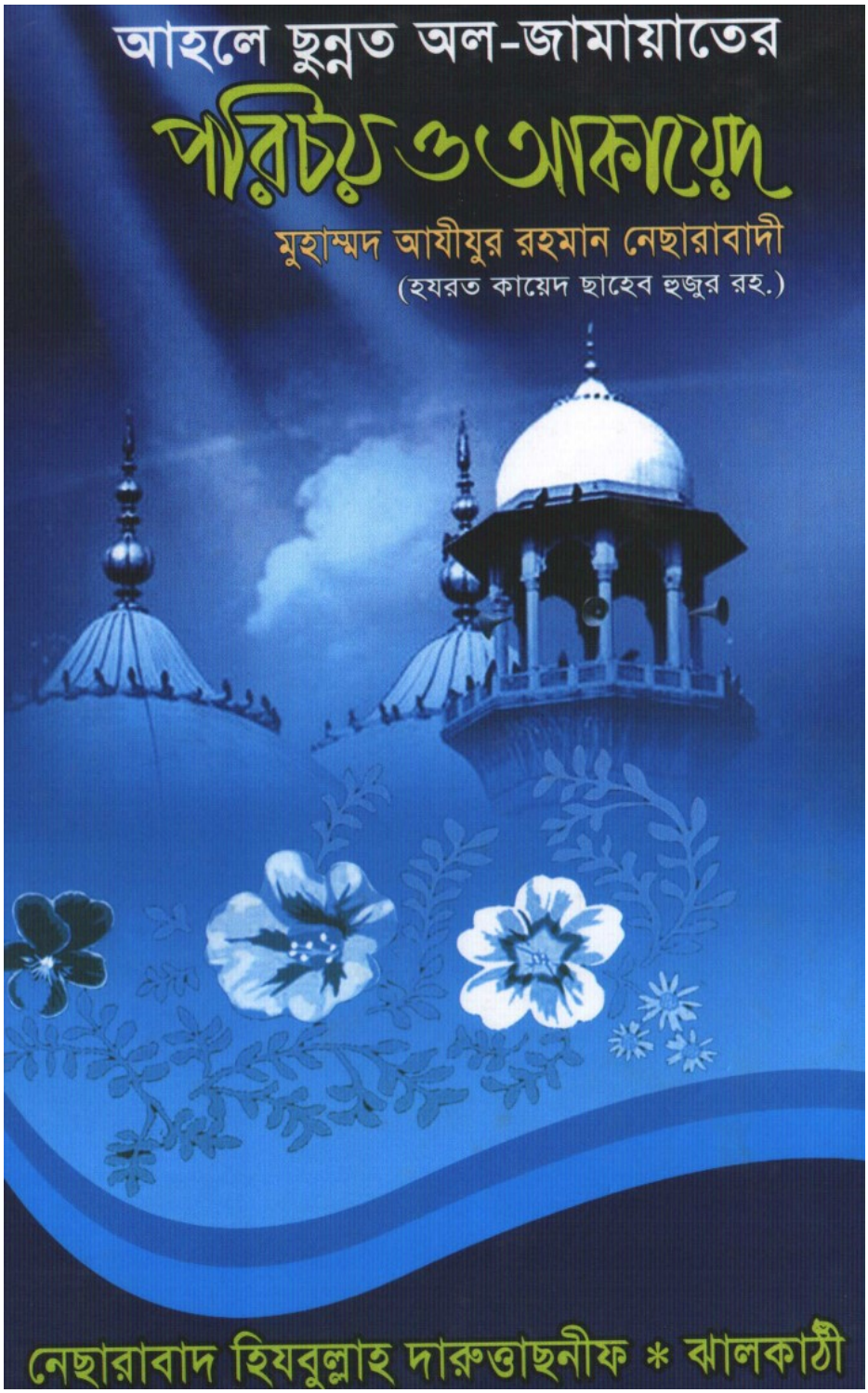

মাওলানা আযীযুর রহমানর নেছারাবাদী কর্তৃক লিখিত গ্রন্থের প্রচ্ছদ